ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থাঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৩০ নভেম্বর ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
এ এস এম জুয়েল, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
নাহিদ শারমিন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

সহযোগিতায়
আবু সালেহ মো. সাদ্দাম, *মাঠ সহকারি*
লুৎফর রহমান, *মাঠ সহকারি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত বিচারক, আইনজীবী, বিচারিক কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সহকর্মীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল তথ্যদাতার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬(নতুন) ২৭(পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯,
৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, চ্যালেঞ্জ ও তার উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে বহুমুখী গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি কাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহায়ক ভূমিকা পালন করা টিআইবির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় অধস্তন আদালতসমূহ বিচারিক সেবা প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দেশে বিচারাধীন মোট মামলার বেশিরভাগই দেশের এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। এই আদালতগুলো দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইতোমধ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অধস্তন আদালতসমূহের উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন আদালত ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণে প্রকল্প গ্রহণ, কেস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা, বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি, ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ, বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু, দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ ধরনের সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যেও বিচার ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে টিআইবি'র চলমান গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়, যেখানে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিরাজমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত অবকাঠামো, আর্থিক বরাদ্দ, লজিস্টিকস, জনবল, প্রশিক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া এ গবেষণায় মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেন এবং বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র উঠে এসেছে। গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সুপ্রীম কোর্ট, অধস্তন আদালত, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি একগুচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করেছে যা যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা করি।

গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত বিচারক, আইনজীবী, বিচারিক কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গবেষণা প্রতিবেদনটির লাইবেল চেক করেছেন ব্যারিস্টার নওশাদ জমির এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন প্রফেসর ড. রেদোয়ানুল হক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক নাজমুল হুদা মিনা, নাহিদ শারমিন ও শাম্মী লায়লা ইসলাম। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধান, সম্পাদনা, পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সিনিয়র প্রোগাম ম্যানেজার এ এস এম জুয়েল মিয়া। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ টিআইবির অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়..6
ভূমিকা..6
১.১ প্রেক্ষাপট ৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৯
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৯
১.৪ গবেষণা পরিধি ৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ১১
গবেষণা পদ্ধতি..১১
২.১ তাত্ত্বিক কাঠামো ১১
২.২ গবেষণার এলাকা নির্বাচন..১১
২.৩ তথ্যের উৎস..১২
২.৪ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১২
২.৫ তথ্যের সত্যতা যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ..১২
২.৬ গবেষণার সময়কাল..১২
২.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৩
২.৮ প্রতিবেদন কাঠামো..১৩
তৃতীয় অধ্যায় ১৪
বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা..১৪
৩.১ সাংবিধানিক বিধানাবলি ও বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা..১৪
৩.২ অধস্তন আদালতের বিচারিক কাঠামো ১৪
৩.৩ বিভিন্ন আদালতের এখতিয়ার..১৬
৩.৪ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ১৭
৩.৫ অধস্তন আদালতের মামলার পরিসংখ্যান ১৮
৩.৭ অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজন ১৯
চতুর্থ অধ্যায়.. ২১
অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা.. ২১
৪.১ আইনি সীমাবদ্ধতা..২১
৪.২ দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ..২১
৪.৩ অবকাঠামো ২২
৪.৪ লজিস্টিকস ২৪
৪.৫ আর্থিক বরাদ্দ ২৫
৪.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ২৬
৪.৭ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগ.. ৩১

৪.৮ আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তি ৩১
পঞ্চম অধ্যায় ৩৩
অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ৩৩
৫.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ৩৩
৫.২ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৮
অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার ৩৮
৬.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানির অভিযোগ ৩৮
সপ্তম অধ্যায় ৪৬
ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ৪৬
৭.১ ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা সম্পর্কে ধারণা ৪৬
৭.২ ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ ৪৬
৭.৩ জাতীয় আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা ৪৭
৭.৩ আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ৪৯
অষ্টম অধ্যায় ৫১
অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ৫১
৮.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ ৫১
৮.২ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল ৫১
৮.৩ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব ৫২
নবম অধ্যায় ৫৩
উপসংহার ও সুপারিশ ৫৩
৯.১ উপসংহার ৫৩
৯.২ সুপারিশ ৫৩
পরিশিষ্ট-১: দেওয়ানী মামলার কার্যপদ্ধতি ৫৫
পরিশিষ্ট-২: ফৌজদারী মামলার কার্যপদ্ধতি ৫৬
তথ্যসূত্র: ৫৭

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের একটি- বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ বিচার বিভাগের একটি অন্যতম অংশ। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার সর্বোপরি আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।[১] একটি দেশের বিচার বিভাগ বলতে আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানকারী বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালসহ সকল ধরনের আদালতকে বোঝায়। প্রচলিত আইন ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে বিচারপ্রার্থী এবং অভিযুক্তদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এই আদালতগুলোর লক্ষ্য। যখন স্বাভাবিক জীবনধারার মধ্য থেকে মানুষের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সে অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিচার কাজ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব গণতান্ত্রিক দেশেই বিধি-বিধান ও আইনকানুন রয়েছে এবং আইনকানুন অনুসরণ করে বিচারকাজ সম্পন্ন করার চর্চা প্রতিষ্ঠিত হলেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতন্ত্র কার্যকর ও অর্থপূর্ণ হয়।[২]

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে রাষ্ট্রে ও সমাজে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিভিন্ন আদালতের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪ থেকে ১১৭ পর্যন্ত বিচার বিভাগ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট, সকল অধস্তন আদালত এবং বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। বাংলাদেশের প্রতিটি আদালতের বিচারিক ক্ষমতা সংবিধান অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক পাশকৃত আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ।[৩]

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং তৎক্রমনিম্নভাবে জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি আদালত রয়েছে। এছাড়াও বিশেষ মামলাসমূহের জন্য রয়েছে বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় অধস্তন আদালতসমূহ বিচারিক সেবা প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সাধারণত বেশিরভাগ মামলাই প্রাথমিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে এই পর্যায়ের নিম্নতম ও এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে শুরু হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (অনুচ্ছেদ ১১৪-১১৬ক) অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা, দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। স্থানীয় পর্যায়ের জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিজেএম), মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিএমএম), বিভিন্ন বিশেষ আদালত (যেমন- স্পেশাল জজ আদালত, বন আদালত ইত্যাদি) ও ট্রাইব্যুনাল (যেমন- নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি) এই অধস্তন আদালতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের সকল জেলা এবং কয়েকটি মহানগরে এ আদালতগুলো অবস্থিত। এছাড়া দেশের কয়েকটি উপজেলায় কিছু চৌকি আদালত[৪] রয়েছে। দেশে বিচারাধীন মোট মামলার বেশিরভাগই (৮৬%) দেশের এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে[৫]। এই আদালতগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীসহ আপামর বিচারপ্রার্থী জনগণ প্রতিদিন আসে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশায়।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগসহ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব কর্মপরিধিতে 'ওয়াচডগের' ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা তথা সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যে দেশে যত বেশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে দেশে তত বেশি গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি অর্জিত হয়। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সুশাসন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে সম্যক বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি

---

[১] http://www.supremecourt.gov.bd/resources/contents/Bani_of_HCJ_2017.pdf (17 October, 2017)

[২] বিচার প্রক্রিয়া: দেওয়ানী ও ফৌজদারী, বিচারপতি মুহম্মদ হামিদুল হক, ২০১৭, ঢাকা

[৩] http://www.judiciary.org.bd/department-of-justice/(Accessed on 6/5/2017)

[৪] উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত আদালতগুলোকে চৌকি আদালত হিসেবে অভিহিত করা হয়

[৫] ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৫টি এবং শুধুমাত্র অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৭ লাখ ১২ হাজার ১২১টি

নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর অনুকূলে আর্থিক ও আইনি সমর্থন দানের বলা হয়েছে।[৬] এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রেও রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমান বিচার প্রাপ্তির অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ ও মাজদার হোসেন মামলার[৭] রায়ের প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসিকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়। দেশের আদালতসমূহের উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বক্স-১.১.১: অধস্তন আদালতের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও জেলা জজ আদালত ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে প্রকল্প গ্রহণ
- কেস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন - মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্যবাতায়ন- সকল জেলার আদালতের জন্য ওয়েবসাইট তৈরী
- আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবর্তন ও প্রসার - ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলার শুনানী রেকর্ড ধারণ ও সংরক্ষণ
- তিন বছর মেয়াদি ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ, বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু
- বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু
- দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান - জাতীয় হেল্পলাইন "১৬৪৩০" স্থাপন এবং আদালত প্রাঙ্গণে আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন
- কয়েকটি জেলার আদালত ভবনে মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষের ব্যবস্থা, আদালত কক্ষের বাইরে বসার ব্যবস্থা, কক্ষ নির্দেশিকা টাঙ্গানো, মামলার তালিকা টাঙ্গানো, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- আদালতগুলোর কার্যকরতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেসরকারি পর্যায়ে (ইউএনডিপি, ইউএসএইডসহ অনান্য) নানা উদ্যোগ

এ ধরনের নানা সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি ও নানা সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ের প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যেও[৮] বিচার ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিচারকের শূন্য পদ, বিশেষ আদালতসমূহে স্থান সংকুলানের তীব্র অভাব, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবকাঠামো সমস্যা, দেশের বিভিন্ন আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম সরবরাহে অপ্রতুলতা, মামলা জট, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবসহ আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও দুর্নীতির বিষয়গুলোও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে।

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২"-এ স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন, বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্ত্বশাসন, বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা, বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা, বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন, যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তির বিষয়গুলোকে বিচার ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৪ সালের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হলেও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালতসমূহ এখনও প্রভাবিত হওয়ায় সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনআকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। সকল সরকারের সময়েই বিচার বিভাগ অব্যাহত হারে রাজনৈতিকভাবে দলীয়করণ হওয়ায় বিতর্কিত নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকুরিচ্যুতি এবং

---

[৬] সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫-১৬/২০১৯-২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2017/02/7th-Five-Year-Plan-Bangla-Book.pdf (Accessed on 6 June, 2017)

[৭] সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাজদার হোসেন মামলা যা মূলত মাজদার হোসেন মামলা নামে অভিহিত করা হয়।

[৮] এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, "এ দেশের যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, সেখানে বিচার বিভাগ আলাদা কোনো দ্বীপের মতো নয় যে, সব জায়গায় অনিয়ম থাকবে আর বিচার বিভাগের সব ফেরেশতা হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না।"- *প্রথমআলো*, ০২ এপ্রিল ২০১৬; সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বলেছেন, "আপনাদের অনেকেই নাজিরদের সঙ্গে অর্থ (টাকা পয়সা) লেনদেন করেন। তাদের কাছ থেকে তোলা নেন বলেও আমার কাছে তথ্য রয়েছে। নাজিরদের কাছ থেকে আর তোলা নেবেন না।"

বিচারকদের আচরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সার্বিকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।[৯] এছাড়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের (২০১০, ২০১২, ২০১৫) সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপেও তথ্যদাতারা বিচারিক সেবা খাতকে অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সারণি-১.১.১: বছরভেদে টিআইবি'র সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপে প্রাপ্ত বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিষয়ক ফলাফল

সাল	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার খানা (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
২০১০	৮৮%	৫৯.৬	৭৯১৮
২০১২	৫৭%	৬৮%	১১৭১১
২০১৫	৪৮.২%	২৮.৯%	৯৬৮৬

টিআইবি'র ২০১০ সালের জাতীয় খানা জরিপে বিচারিক সেবা অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে শীর্ষে উঠে আসলে বিষয়টি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি প্রদত্ত একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, "বিচার ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের দুর্নীতি যে বিরাজমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এ সম্পর্কে সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করে দুর্নীতি হ্রাস করার প্রয়াস অতি দ্রুত গ্রহণ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই।"[১০] টিআইবি'র ২০১৫ সালের জাতীয় খানা জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, দেওয়ানি আদালতে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৪৯.৪%, ফৌজদারি আদালতে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৪১.৪% এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৪৭.৬% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

সারণি-১.১.২: টিআইবি প্রকাশিত সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫-এ প্রাপ্ত বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিষয়ক ফলাফল

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার খানা (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
দেওয়ানি আদালত	৭৩.১	৪৯.৪	২৯.৫	১১,৩৭০
ফৌজদারি আদালত	২৩.৯	৪১.৪	২৭.১	৯,৯১৩
বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল	৪.৩	৪৭.৬	২২.৫	৯,৫৩৩

ইউএনডিপি'র (২০১৫) একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পদ্ধতিগত জটিলতা, মামলাজট এবং ফলপ্রসূ মামলা ব্যবস্থাপনার অভাব। এই প্রতিবেদনে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এবং মামলাজটকে প্রধান দৃশ্যমান দু'টি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউএনডিপি (২০১৫) পরিচালিত জেলা আদালতের উপর একটি খানা জরিপে দেখা যায়, ৩১ শতাংশ জনগণ মনে করেন বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিদ্যমান। এছাড়া ১১ শতাংশ জনগণ বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আরও দেখা যায় যে, ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের (সংহিসতার শিকার) জন্য আদালতে বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন- নিরাপত্তা, বসার স্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা লক্ষ করা যায়। গত তিন বছরে বিচার ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ২৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের ২১ শতাংশ মনে করেন যে, গত তিন বছরে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।[১১] বিচার ব্যবস্থার ওপর পরিচালিত ইউএনডিপির একটি প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদনে (২০১৩)বলা হয়েছে যে, আদালত থেকে সেবাগ্রহণকারী ৭৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা আদালতের সেবায় সন্তোষ প্রকাশ করেনি। যেসকল সেবাগ্রহীতা সন্তুষ্ট হননি তাদের মধ্যে ৩১ শতাংশ সেবা পেতে কালক্ষেপণ, ১৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতা আইনজীবীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১২]

[৯] 'জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ', প্রফেসর সালাউদ্দিন আমিনুজ্জামান এবং প্রফেসর সুমাইয়া খায়ের, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪

[১০] বিচার বিভাগ সম্পর্কে টিআইবি প্রতিবেদনের মূল্যায়ন, সুপ্রীম কোর্ট, ২০১১

[১১] Access to Justice in Bangladesh Situation Analysis: Summary Report; conducted by Data Management Aid; Justice Sector Facility Project, Law and Justice Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, UNDP, UK aid; May 2015.

[১২] Annual Report 2013; Judicial Strengthening Project, Supreme Court of Bangladesh; UNDP.

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৭ সালের গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে যে, বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং কার্যকর শাসন ব্যবস্থা বিঘ্নিত করছে।

ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট এর রুল অফ ল ইনডেক্স ২০১৬-এ বাংলাদেশের স্কোর ০.৪১ (এখানে সর্বোচ্চ স্কোর ১ যা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে ভালো বা শক্ত অবস্থান নির্দেশ করে এবং সর্বনিম্ন স্কোর ০) এবং ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩। এই গবেষণার "দুর্নীতির অনুপস্থিতি" সূচকের আওতায় "বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি নেই" এই উপ-সূচকের স্কোর হচ্ছে ০.৩২।[১৩]

একইভাবে দেশের গণমাধ্যমেও অধস্তন আদালতের দুর্নীতি ও বিচারপ্রার্থীদের নানা হয়রানি সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ঘুষ লেনদেন[১৪], নথি গায়েব ও বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে ডিক্রি পরিবর্তন[১৫], আদালতগুলোতে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম[১৬], প্রতারণা[১৭] জালিয়াতিসহ[১৮] বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে অধস্তন আদালতগুলোর তদারকি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যে দ্বন্দ্ব সে বিষয়টিও বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিত হতে দেখা গিয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ও সেখানে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে সার্বিকভাবে নানা গণমাধ্যমের প্রতিবেদন ও গবেষণাকর্ম থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে অধস্তন আদালত ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জকেন্দ্রিক গবেষণাকর্মের ঘাটতি রয়েছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

দেশের আদালতসমূহের কার্যকরতা বৃদ্ধি ও সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে অধস্তন আদালতের বিচারিক ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরী। টিআইবি বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা (দ্রুত বিচার আদালত, রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও জাতীয় খানা জরিপ) এবং তার আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এবং অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সার্বিকভাবে নানা গবেষণাকর্ম থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে অধস্তন আদালত ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জকেন্দ্রিক গবেষণাকর্মের ঘাটতি রয়েছে। এ গবেষণাটি অধস্তন আদালতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা । এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১) বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা;

২) বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার চর্চার বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; এবং

৩) অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণা পরিধি

এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থা বলতে অধস্তন আদালত এবং অধস্তন আদালত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে। এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত, যেমন- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও

---

[১৩] http://data.worldjusticeproject.org/#groups/BGD (Accessed on 13 June, 2017)

[১৪] *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ জুন ২০১৬, প্রথম আলো, সোমবার, ২২ মে ২০১৭

[১৫] *দৈনিক যুগান্তর*, ১২ জুন ২০১৬

[১৬] *দৈনিক প্রথম* আলো, ৪ মে, ২০১৫

[১৭] *কালের কণ্ঠ*; ৭ মার্চ, ২০১৭

[১৮] *প্রথম আলো*; ২৩/০৩/২০১৭

কিছু বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি। এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও শুদ্ধাচার) আলোকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত কয়েকটি জেলা ও মহানগর এলাকায় অবস্থিত আদালত ব্যবস্থার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সক্ষমতার মধ্যে আদালতগুলোর অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বরাদ্দের বিষয়গুলো গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধীনে তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ, আইনজীবীদের জবাবদিহিতা ও তদারকি, আদালতের সার্বিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচারের মধ্যে আদালতে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি, বিদ্যমান দুর্নীতি-অনিয়মের ধরন ও কারণ সম্পর্কে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ অধস্তন আদালত ব্যবস্থার সকল অংশীজন তথা সকল বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবী ও অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে অধস্তন আদালত ব্যবস্থার বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

২.১ তাত্ত্বিক কাঠামো

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন বা প্রবন্ধে বিচার বিভাগের সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা সূচকের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৭[১৯]-এ বিভিন্ন দেশের বিচার বিভাগ বিষয়ক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রোমানিয়া (২০১৫) একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এতে বলা হয়েছে একটি দেশের বিচার বিভাগকে কার্যকর হিসেবে তখন বিবেচনা করা হবে যখন বিচার বিভাগের মধ্যে আইনি বাধ্যবাধকতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচারের জন্য কার্যকর প্রশাসন এবং স্বচ্ছতার উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে।[২০] এ গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে আইনের প্রয়োগ, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, শুদ্ধাচার, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, ও যথাযথ বিচার প্রশাসনকে চিহ্নিত করা হয়েছে[২১]। এছাড়া ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অফ ল ইনডেক্স ২০১৬-এ কার্যকর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অভিগম্যতা ও সাশ্রয়ী ন্যায়বিচার, বৈষম্যমুক্ত ন্যায়বিচার, দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়বিচার, সরকারের অসঙ্গত প্রভাবমুক্ত ন্যায়বিচার, বিচারিক ব্যবস্থায় অযাচিত দীর্ঘসূত্রতা না থাকা, ন্যায়বিচার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা, সময়োপযোগী ও কার্যকর বিচারিক ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে[২২]। অন্যদিকে ইউনাইডেট ন্যাশনস ইউনিভার্সিটির (২০০৩) ১৬টি উন্নয়নশীল দেশের বিচার বিভাগের উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ ও তার অবস্থা পরিমাপে মূলত অভিগম্যতা, যথাযথ প্রক্রিয়া, স্বায়ত্ত্বশাসন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য, বিরোধ নিষ্পত্তিতে নন-জুডিসিয়াল মেকানিজম-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।[২৩] একইভাবে ব্যাঙ্গালোর প্রিন্সিপলস ২০০২[২৪]-এ বিচারকদের প্রয়োজনীয় আচরণবিধি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও প্রশাসনিক সক্ষমতার বিষয়ে বিভিন্ন নিয়ম ও বিধানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক গবেষণার আলোকে এ গবেষণার জন্য সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও শুদ্ধাচার- এ সূচকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি-২.১.১: এ গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের সূচক ও উপ-সূচক

গবেষণায় ব্যবহৃত সূচক	উপ-সূচক
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	আইনি সক্ষমতা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, আর্থিক বরাদ্দ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (জনবল, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি)
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ ব্যবস্থা
জবাবদিহিতা	বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি) ও শৃঙ্খলা বিধান, নিরীক্ষা, আইনজীবীদের জবাবদিহিতা ও তদারকি, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার চর্চা, দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রভাব

২.২ গবেষণার এলাকা নির্বাচন

তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিটি থেকে দুটি করে মোট ১৬টি জেলা নির্বাচন এবং দুটি বিভাগ থেকে বিশেষ বিবেচনায় অতিরিক্ত একটি করে আরো দুটি জেলা, এভাবে মোট ১৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়। জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়েও অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[19] Global Corruption Report 2007, Cambridge University Press, New York. ISBN 978-0-521-70070-2

[২০] ENHANCING JUDICIARY'S ABILITY TO CURB CORRUPTION A practical guide; Transparency International Romania; 2015.

[২১] প্রাগুক্ত

[২২] The World Justice Project Rule of Law Index 2016®, ISBN (online version): 978-0-9882846-1-6.

[২৩] The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries; Julius Court, Goran Hyden and Ken Mease; World Governance Survey Discussion Paper 9; May 2003.

[24] https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf- Access on 20th September, 2017

সারণি-২.২.১: তথ্য সংগ্রহের এলাকা নির্বাচন

জেলার ধরন	মোট সংখ্যা	নির্বাচিত এলাকার সংখ্যা
বিভাগীয় জেলা	৮	৮
অন্যান্য জেলা	৫৬	১০
মোট	৬৪	১৮

২.৩ তথ্যের উৎস

গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা, আইনজীবী (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীসহ), জেলা বার সমিতির সভাপতি, আইনজীবীর সহকারী/মুহুরী, বিচারপ্রার্থী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কর্মকর্তা, জেলা আইনগত সহায়তা সংস্থার কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, ও গণমাধ্যম কর্মী। মোট ৪৩৭ জন তথ্যদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, অধস্তন আদালত থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, সংবাদ ও প্রবন্ধ। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধসহ যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি বিধায় তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

২.৪ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন- সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে (সারণি ২.৪.১)।

সারণি-২.৪.১: প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	▪ অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ▪ অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ▪ জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা ▪ আইনজীবী (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীসহ) ▪ জেলা বার সমিতির সভাপতি ▪ আইনজীবীর সহকারি/মুহুরী ▪ বিচারপ্রার্থী ▪ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কর্মকর্তা ▪ জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কর্মকর্তা ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ▪ এনজিও প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মী	৩৬৮ জন
দলীয় আলোচনা (৯টি)	চেকলিস্ট	▪ আইনজীবী ও গণমাধ্যম কর্মী	৬৯
সরেজমিন পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	নির্বাচিত এলাকার অধস্তন আদালতসমূহ	

২.৫ তথ্যের সত্যতা যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে এবং এসব তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সার্বক্ষণিকভাবে মাঠে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা হয়।

২.৬ গবেষণার সময়কাল

২০১৭ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া এ গবেষণায় অধস্তন আদালতের ২০১৪-২০১৬ সময়কালের সুশাসনের চিত্র বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণায় ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যদাতারা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এসকল অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য পাওয়া গেলে এ প্রতিবেদনটি আরো সমৃদ্ধ হত।

২.৮ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস, আদালতের বিবর্তন, উল্লেখযোগ্য অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্মপরিধি ও এখতিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ-প্রভাব-ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে নবম অধ্যায়ে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধ এবং সুশাসনের ঘাটতি হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা

৩.১ সাংবিধানিক বিধানাবলি ও বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এই ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৯৪-১১৩ অনুচ্ছেদগুলোতে সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও এখতিয়ার সম্পর্কে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১৪-১১৬ক অনুচ্ছেদগুলোতে অধস্তন আদালত সম্পর্কে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইন দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।" বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী নিয়োগদান করিবেন এবং বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলা বিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে।" এছাড়া ১১৬ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে যে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।"

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানের ১১০ ও ১১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে, "হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোনো অধস্তন আদালতের বিচারাধীন কোনো মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নিবেন এবং স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরত পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।" আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। অধস্তন আদালতের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতার অংশ হিসাবে প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণ বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অধস্তন আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন এবং বারের আইনজীবীদের সাথে মত বিনিময় করে থাকেন।

অন্যদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল ১ (Allocation of Business among the different Ministries and divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ সরকারি কৌঁসুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অধস্তন আদালতের ওপর সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়- এই দুই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে। বিভিন্ন কাজের জন্য অধস্তন আদালতকে এই দুই কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার দেখা যায় যে, একই কাজের জন্য একইসাথে দুই কর্তৃপক্ষের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

৩.২ অধস্তন আদালতের বিচারিক কাঠামো

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি সংবিধান প্রণয়ন করে যাতে আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের গঠন প্রণালি ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অধস্তন বিচার বিভাগ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি ব্যবস্থা উভয়ের উৎপত্তি হয়েছিল দেওয়ানী আদালত আইন, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ১৮৯৮ থেকে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ল'স কন্টিনিউএন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার, ১৯৭১ পাশ করা হয় যার ফলে বাংলাদেশে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর পূর্বে পাশকৃত সকল আইন বলবত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭৪০টি আইন, ৫০৭টি অধ্যাদেশ এবং বহু রেগুলেশন প্রচলিত রয়েছে।[২৫] বাংলাদেশের আদালতগুলো এই আইনগুলো দ্বারাই

[২৫] http://www.judiciary.org.bd/department-of-justice

পরিচালিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে আরও কতিপয় বিশেষ আইন আছে, যা কিছু বিশেষ আদালতের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে, যেমন- শ্রম আদালত, শিশু অপরাধ আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

সাধারণত বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের আদালত ও ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মামলা বিচারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর আদালত ও ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমাদের দেশেও মামলার ধরন ও এলাকার অধিক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আদালত রয়েছে। বাংলাদেশের আদালত কাঠমোটি নিম্নরূপ:

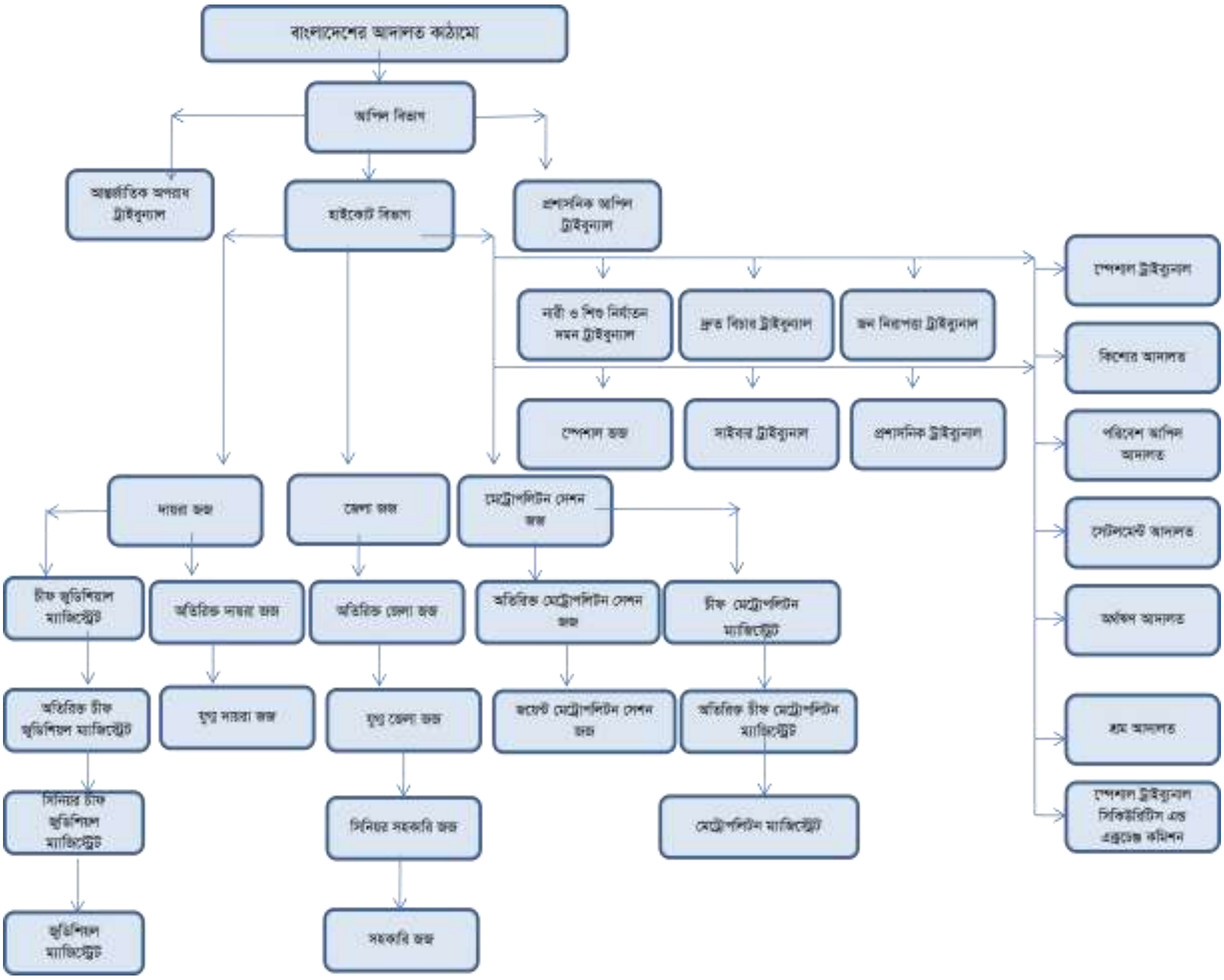

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত এবং সুপ্রীম কোর্ট ঢাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় দেখা যায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবস্থান সকল আদালতের উপরে এবং আপীল বিভাগের অধীনে রয়েছে হাইকোর্ট বিভাগ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল।

দেশের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলো দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহানগরগুলোতে অবস্থিত। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে এ আদালতগুলো কাজ করে থাকে। বিচারিক কাঠামো অনুযায়ী জেলা জজ আদালত ও তার অধীনস্ত আদালতগুলো হচ্ছে- অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সিনিয়র সহকারি জেলা জজ আদালত এবং সহকারী জেলা জজ আদালত। অপরদিকে, দায়রা জজ আদালত ও তার অধীনস্ত আদালতগুলো হচ্ছে- অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, যুগ্ম দায়রা জজ আদালত এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এছাড়া চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অধীনে রয়েছে- অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি জেলায় একটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত থাকে এবং এ পদে একজন বিচারক নিয়েজিত থাকেন যিনি জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে অভিহিত হন। যখন উক্ত বিচারক ফৌজদারী মামলার বিচার করেন তখন তিনি দায়রা জজ হিসেবে এবং যখন দেওয়ানী মামলার বিচার করেন তখন তিনি জেলা জজ হিসেবে অভিহিত হন। একইভাবে, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত কাজ করে থাকে।

অন্যদিকে মহানগর বা মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে মহানগর দায়রা জজ আদালত থাকে এবং এর সরাসরি অধীনস্ত আদালতগুলো হচ্ছে- অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত, যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত এবং চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। একইভাবে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরাসরি অধীনস্ত আদালতগুলো হচ্ছে- অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

এছাড়া, বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামোয় আরো কিছু আদালত দেখা যায়। যেমন- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল, জন নিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ জজ আদালত, শ্রম আদালত, কিশোর অপরাধ আদালত, অর্থঋণ আদালত ইত্যাদি।

৩.৩ বিভিন্ন আদালতের এখতিয়ার

প্রত্যেকটি আদালতের অধিক্ষেত্র আইন দ্বারা নির্ধারিত করা হয়েছে। দেওয়ানী আদালতগুলো দেওয়ানী আদালত আইন, ১৮৮৭ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এর ৯ ধারায় সকল প্রকার দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার[২৬] বিচার করার এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতসমূহকে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ানী আদালতের অধিক্ষেত্র দুটি বিষয় বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়ে থাকে -১) এলাকাভিত্তিক, ২) বিষয়বস্তুর মূল্যমানভিত্তিক।[২৭] দেওয়ানী আদালতসমূহের এখতিয়ার নিম্নরূপঃ

সারণি-৩.৩.১: দেওয়ানী আদালতসমূহের এখতিয়ার

আদালত	এখতিয়ার
জেলা জজ আদালত	রিভিশন এখতিয়ার, দেওয়ানী বিষয়বস্তুর আপীল যার মূল্যমান সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা, প্রবেট সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত	জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত সকল মামলাসমূহের বিচার অত্র আদালত কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে
যুগ্ম জেলা জজ	সকল প্রকার দেওয়ানী মামলা যার মূল্যমান পচিশ লক্ষ টাকা থেকে অসীম, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি, রিভিশন- জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত মামলাসমূহ, আপীল- জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত মামলাসমূহ
সিনিয়র সহকারী জজ	দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার যার মূল্যমান পনের লক্ষ টাকা থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
সহকারী জজ	দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার যার মূল্যমান সর্বোচ্চ পনের লক্ষ টাকা
স্মল কজেস কোর্ট	স্মল কজেস আদালত ক্ষুদ্র মামলা নিষ্পত্তি করে থাকে যার মূল্যমান সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা
পারিবারিক আদালত	পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ অনুযায়ী অত্র আইনের অধীনে দায়েরকৃত পারিবারিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাক্রমে- তালাক, দেনমোহর, ভরণ-পোষণ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার এবং নাবালকের অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিষয়াদির মামলার বিচার অত্র আদালতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান এবং ধাপ[২৮] রয়েছে। সাধারণত আরজি দাখিলের মাধ্যমে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে হয়। আরজিটি আদালতে গৃহীত হলে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত হয়ে বর্ণনা দাখিলের জন্য বিবাদীগণের উপর সমন জারি করা হয়। এভাবে একটি দেওয়ানী মামলা শুরু হয়। একইভাবে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন, ১৮৯৮ এর ৬ ধারায় বিভিন্ন শ্রেণীর ফৌজদারী আদালতের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী সকল ফৌজদারী আদালতগুলোকে দু'টি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়েছে- (১) দায়রা আদালত (২) ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। কোন মামলা কোন আদালতে বিচার্য হবে তা এই আইনে উল্লেখিত রয়েছে। এই আইনের ২৮ ও ২৯ ধারায় দন্ডবিধি, ১৮৬০ এবং অন্যান্য আইনের অপরাধের মামলার বিচার করা এবং শাস্তি বিধানের ক্ষমতা ফৌজদারী আদালতগুলোকে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত ফৌজদারী মামলা[২৯] কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আদালতে পেশকৃত কোনো লিখিত বা মৌখিক বক্তব্যের ভিত্তিতে এবং কোনো এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ কর্তৃক তদন্তের পরে রিপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে দায়ের হতে পারে।[৩০]

[২৬] দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা হলো যে মামলায় কোন সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে বা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকা বা হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা থাকে।

[২৭] বিচার প্রক্রিয়া: দেওয়ানী ও ফৌজদারী, বিচারপতি মুহম্মদ হামিদুল হক, ২০১৭, ঢাকা

[২৮] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ১: দেওয়ানী মামলার কার্যপদ্ধতি

[২৯] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ২: ফৌজদারী মামলার কার্যপদ্ধতি

[৩০] বিচার প্রক্রিয়া: দেওয়ানী ও ফৌজদারী, বিচারপতি মুহম্মদ হামিদুল হক, ২০১৭, ঢাকা

সারণি-৩.৩.২: ফৌজদারী আদালতসমূহের এখতিয়ার

আদালত	এখতিয়ার
দায়রা জজ আদালত	আইনে উল্লিখিত সকল প্রকারের দন্ড প্রদানে অত্র আদালত সক্ষম তবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করলে উক্ত রায় হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।
অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত	আইনে উল্লিখিত সকল প্রকারের দন্ড প্রদানে অত্র আদালত সক্ষম তবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করলে উক্ত রায় হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।
যুগ্ম দায়রা জজ আদালত	অত্র আদালত মৃত্যুদন্ড,যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা দশ বছরের অধিক কারাদন্ড ব্যতীত আইনে উল্লিখিত সকল প্রকার সাজা প্রদানে সক্ষম।
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	অত্র আদালত পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে সক্ষম।
দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	অত্র আদালত তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে সক্ষম।
তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	অত্র আদালত দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে সক্ষম।

অন্যদিকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ব্যতীত দেশের বিদ্যমান অন্যান্য ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আদালতসমূহ সুনির্দিষ্ট আইনবলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই আদালতগুলো উক্ত আইন আনুযায়ী পরিচালিত হয়। নিচে দেশের কিছু ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আদালতসমূহের এখতিয়ার তুলে ধরা হলো।

সারণি-৩.৩.৩: বিশেষ আদালতসমূহের এখতিয়ার

আদালত	এখতিয়ার
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহের বিচার অত্র ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়।
দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন,২০০২ এর অধীনে সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের বিচার অত্র আদালত কর্তৃক সম্পাদিত হয়।
দ্রুত বিচার আদালত	অত্র আদালত কর্তৃক আইন, শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন, ২০০২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহের বিচার সম্পন্ন হয়।
বিশেষ আদালত	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর অধীনে দায়েরকৃত অপরাধসমূহের বিচার অত্র আদালত কর্তৃক সম্পন্ন হয়।
শ্রম আদালত	কল-কারখানা হতে উদ্ভুত বিরোধের নিস্পত্তি শ্রম আদালতে করা হয়ে থাকে।
অর্থঋণ আদালত	ব্যাংক অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।
বিশেষ জজ আদালত	দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ এবং অপরাধ আইন সংশোধন আইন, ১৯৫৮ এর মামলাসমূহ অত্র আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়।
ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল	প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ১৪৫ক অনুযায়ী ভূমি জরিপ সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য স্থাপিত হয়েছে।
পরিবেশ আদালত	পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে অত্র আদালতে মামলা করা হয়ে থাকে।
বন আদালত	বন আইন, ১৯২৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার বন আদালতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩.৪ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। কিন্তু ২০০৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় ছিল এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যের সাথে যুক্ত ছিল। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের সূচনা ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর মাজদার হোসেন মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে (৫২ ডিএল আর ২০০০)। বেতন স্কেল বৃদ্ধি

সংক্রান্ত কারণে[৩১] মামলাটি দায়ের হয়েছিল। তবে সেই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিষয়ে ১২ দফা নির্দেশনা আসে। বস্তুত এ রায়ে ঘোষণা করা হয় যে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিচার) সদস্য হিসেবে গণ্য না করে এদের একটি পৃথক সার্ভিস হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদেরকেও প্রশাসনিক ক্যাডার থেকে পৃথক করতে হবে। এছাড়া এই নবগঠিত সার্ভিসের সদস্যদের নিয়োগ, বেতনক্রম, বদলি ইত্যাদি নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে এসব ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। উপর্যুক্ত বিষয়াবলি বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রীম কোর্ট আরও তিনটি নির্দেশ প্রদান করে। সেগুলোর একটি হলো পৃথক জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এবং বেতন কমিশন গঠনসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন। এই রায় ঘোষণার ৮ বছর পর ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়। ২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবিধান এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা জারি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করা হয়। তখন থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচারিক দায়িত্ব এবং সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নির্বাহী ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন।[৩২] ৪১ জন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৬০ জন অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ২০১ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে নিম্ন-আদালতের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।[৩৩]

তবে কিছু ক্ষেত্রে এখনও বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী জনপ্রশাসন দ্বারা সম্পন্ন হতে দেখা যায়। যেমন- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগ মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর ৯টি ধারা যার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বৈধতা দেওয়া হয়েছে তা অবৈধ ঘোষণা করেন। এ বিচারিক রায়ে বলা হয় মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৫,৬ (১,২,৪), ৭, ৮(১), ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৫ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ধারাগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে (নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ) ক্ষমতার পৃথকীকরণ সংক্রান্ত সংবিধানের দু'টি মৌলিক কাঠামো বিরোধী[৩৪]। তবে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্টের এই রায় স্থগিত করেন।[৩৫]

৩.৫ অধস্তন আদালতের মামলার পরিসংখ্যান

১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত, দেশের সকল আদালতে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩১ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৫টি। এর মধ্যে দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার সংখ্যা ১২,৮৫,৯২৩টি, ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ১৭,৭৮,৫৩৮টি এবং অন্যান্য মামলা ৭৪,৮১৪টি। নিচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বিদ্যমান মামলার সংখ্যা ছিল ২৭,০২,২৬৮টি। ১ জুলাই- ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালতসমূহে (সকল জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ সকল প্রকার ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত) বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ২৭ লাখ ১২ হাজার ১২১টি। অর্থাৎ তিন মাসে নতুন দায়েরকৃত, পুনরুজ্জীবিত মামলা ও নিষ্পত্তিকৃত ও বদলি মামলার সংখ্যা বিবেচনায় প্রায় ১০ হাজার মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৩১] ১৯৮৯ সালে সরকার বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কিছু পদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি করে। এতে অন্য ক্যাডারদের সঙ্গে অসঙ্গতি দেখা দেয়। তৎকালীন সরকার এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য ১৯৯৪ সালের ৮ জানুয়ারি জজ আদালতের বেতন স্কেল বাড়িয়ে দেয়। তবে প্রশাসন ক্যাডারের আপত্তির মুখে সরকার ওই বর্ধিত বেতন স্কেল স্থগিত করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জুডিসিয়াল সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন মহাসচিব মাজদার হোসেনসহ ৪৪১ জন বিচারক ১৯৯৫ সালে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ শুনানী শেষে ১৯৯৭ সালে হাইকোর্ট পাঁচ দফা সুপারিশসহ ওই মামলার রায় দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে আপিল বিভাগ ১৯৯৯ সালে ১২ দফা নির্দেশনা দিয়ে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার ঐতিহাসিক রায়টি দেন।

[৩২] http://bn.banglapedia.org/index.php?title= (Accessed on 9/7/2017) এবং বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ৯ বছর: আইন কার্যকরে ধীর গতি, http://freedombd24.com (Accessed on 9/7/2017)

[৩৩] https://www.newsroom24bd.org/bn/n/national/8603/Department-of-Justice

[৩৪] মোবাইল কোর্ট আইন অকার্যকর, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে, ২০১৭

[৩৫] Mobile courts by executive magistrates till Oct 31, Banglanews24.com, http://www.banglanews24.com/national/article/64184/Mobile-courts-by-executive-magistrates-till-Oct-31 (Accessed on 24 October 2017)

সারণি-৩.৫.১: দেশের সকল অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যান (১ জুলাই ২০১৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)

আদালত	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যমান মামলার সংখ্যা	১ জুলাই- ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত নতুন দায়ের ও পুনরুজ্জীবিত	মোট (২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	নিস্পত্তি (২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	বদলি (২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	বিচারাধীন (২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
সকল জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ সকল প্রকার ট্রাইব্যুনাল	১৮,১৪,২৯০	১,৩৬,০৮০	১৯,৫০,৩৭০	১,২২,৪১৪	৬,১২৩	১৮,২১,৮৩৩
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	৮,৮৭,৯৭৮	১,৯৪,২৩০	১০,৮২,২০৮	১,৯১,৯২০	-	৮,৯০,২৮৮
মোট	২৭,০২,২৬৮	৩,৩০,৩১০	৩,০৩২,৫৭৮	৩,১৪,৩৩৪	৬১২৩	২৭,১২,১২১

৩.৭ অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজন

অধস্তন আদালতগুলোর সাথে বিভিন্ন ধরনের অংশীজন বা বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা থাকতে দেখা যায়। বিচারকরা তাদের পদমর্যাদা ও আদালতের এখতিয়ার অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন। একইভাবে বিচারক ব্যতীত আদালতের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরাদেরও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। নিচের সারণীতে অধস্তন আলাদত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হলো:

সারণি- ৩.৭.১: অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন

অংশীজনের ধরন	সুনির্দিষ্ট অংশীজন
তত্ত্বাবধান	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ
বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ
নিয়োগ	জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
প্রশিক্ষণ	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জাটি)
বিচারক	জেলা ও দায়রা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, সিনিয়র সহকারি জজ, সহকারি জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন সেশন জজ, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন সেশন জজ ও যুগ্ম মেট্রোপলিটন সেশন জজ ইত্যাদি
সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্যাশিয়ার/নায়েব/নাজির, পেশকার, সেরেস্তাদার, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, স্টেনো টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী/বেঞ্চ সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, নিম্নমান সহকারী, জারিকারক, রেকর্ডকীপার, নকলকারক, তুলনাকারক, তুলনা সহকারী, সেরেস্তা সহকারী, লাইব্রেরী সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহায়ক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি
আইনজীবীদের সনদ প্রদান ও তদারকি সংস্থা	বার কাউন্সিল
আইনজীবী	আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারি, জেলা আইনজীবী সমিতি, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (Public Prosecutor, এডিশনাল পিপি, এপিপি, জিপি (Government Pleader), এজিপি)
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও জেলা আইনগত সহায়তা অফিস	লিগ্যাল এইড অফিসার, কর্মচারি, বিচারপ্রার্থী ও প্যানেল আইনজীবী
সহায়ক প্রতিষ্ঠান	পুলিশ (সিআই, জিআরও ইত্যাদি), জেল কর্তৃপক্ষ
বিচারপ্রার্থী	বাদী, বিবাদী
গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ	সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও, উন্নয়ন

	সহযোগী

বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালতের অন্যতম এক অংশীজন এবং দেশের সকল আদালত প্রাঙ্গণে কর্মদিবসে বিচারপ্রার্থীদের উপস্থিতি দেখা যায়। অন্যদিকে আইনজীবীগণ বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪(১) উপধারার (ক) দফা অনুসারে কোনো আদালতের কার্যক্রম প্রসঙ্গে "অ্যাডভোকেট" অর্থ বলবৎ আইন অনুসারে এরূপ যে কোনো আদালতে আইন ব্যবসা করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অ্যাডভোকেট বা মোক্তার এবং এরূপ কার্যক্রমে আদালতের অনুমতিক্রমে নিযুক্ত অন্য যে কোনো ব্যক্তি। তারা "Officer of the Court" হিসেবেও অভিহিত হন। আইনজীবীরা মামলার বাদী বা বিবাদী পক্ষ অবলম্বনের মাধ্যমে মামলা পরিচালনার সাথে যুক্ত হন এবং আদালতের সামনে মামলার বিবাদমান পক্ষসমূহের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ও নথিপত্র উপস্থাপনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করেন। আইন পেশা চর্চার জন্য একজন আইনজীবীকে নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে সনদ গ্রহণের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হতে হয়। এরপর তিনি নির্দিষ্ট জেলার আইনজীবী সমিতির সদস্য হয়ে উক্ত জেলার আদালতগুলোতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি[৩৬]। যে সকল মামলার বাদী রাষ্ট্র সেসব মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জড়িত থাকেন।

অপরদিকে, অধস্তন আদালতগুলোর সাথে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও জেলা আইনগত সহায়তা অফিস জড়িত। এর মাধ্যমে সাধারণত দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ ও মামলা পরিচালনায় সহযোগিতা করা হয়। এছাড়া অধস্তন আদলতের আরও একটি অংশীজন হলো পুলিশ। মূলত ফৌজদারী General Registerd মামলাসমূহের নথি ও প্রয়োজনীয় আলামত বিচারকের নিকট উপস্থাপনে সিআই (Court Inspector), জিআরও মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, আদালতে কারাগার কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও এবং গনমাধ্যম অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

[৩৬] তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

চতুর্থ অধ্যায়
অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৪.১ আইনি সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণায় অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদগুলোতে একদিকে অধস্তনসহ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং অপরদিকে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল ১ (Allocation of Business among the different Ministries and divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন, অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ সরকারি কৌঁসুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এর ফলে অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান থাকায় দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিরাজ করছে। বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ (পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলি) এর কারণে কিছু ক্ষেত্রে পদোন্নতি পাওয়ার পর পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ এ বলা হয়েছে যে কোনো সদস্য কোনো উচ্চতর পদে ও বেতন স্কেলে পদোন্নতি পেলে বা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এ কারণে কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিচারক পরবর্তী পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাচ্ছে না।

অন্যদিকে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণমূলক বিধান কোনো আইনে সুস্পষ্ট নেই। এছাড়া তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আইনগুলোতে বিচারিক কার্যক্রমের জন্য সুনিদিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ না করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে। যেমন- দেশের বিভিন্ন দায়রা আদালতে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর অধীনে দায়েরকৃত হাজার হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। ফলে দায়রা আদালতগুলো হত্যা, ডাকাতি তথা অন্যান্য গুরুতর অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি না করে উক্ত আইনের মামলাগুলোর বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকে। সংগত কারণে উক্ত আইনে মামলাগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এবং উক্ত আইনের অপরাধ আপোষযোগ্য করা হলে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভনা রয়েছে বলে তাদের অভিমত।[৩৭] এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ শিশু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বয়স মানব পাচার আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন এবং শিশু আইন এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় প্রায়োগিক জটিলতা তৈরি হয়েছে।[৩৮]

৪.২ দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ ও ১১৬ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলি অনুযায়ী অধস্তন আদালতের ওপর একই সাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় কার্য সম্পাদনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে বলে উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন।

প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা: অধস্তন আদালত সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত (বদলি, পদোন্নতিসহ অন্যান্য) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব, পরামর্শ ও অনুমোদনের জন্য সুপ্রীম কোর্টের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিএ) কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। হাইকোর্টের জিএ কমিটির সভা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। জিএ কমিটি অনুমোদন দিলে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় উক্ত বিষয়ে আদেশ জারি করে। কোনো বিষয়ে জিএ কমিটির আপত্তি থাকলে উক্ত বিষয়টি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে যাচাই বাছাই করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা আবার মন্ত্রণালয় হতে জিএ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এরকম প্রেক্ষাপটে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং সময়ক্ষেপণ হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

[৩৭] জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬: প্রধান বিচারপতির বক্তব্য

[৩৮] প্রতিবেদন: জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, এ কারণে কিছু ক্ষেত্রে বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি: দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই প্রশাসনের নিজস্ব কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের স্ব-স্ব পছন্দনীয় ব্যক্তিদের পদায়নে সচেষ্ট থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে অনেকসময় দুই প্রশাসনের মধ্যে অপ্রকাশিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কিছু প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তে সুপ্রীম কোর্ট অপরাগতা জানায় এবং উক্ত সিদ্ধান্তের নথিপত্র মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ও কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রেরিত বিষয় সরকারি আদেশ (জিও) না করে তা ফেলে রাখে এমন অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবে সুপ্রীম কোর্ট তা নাকচ করে দেওয়ার পরও মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করে এবং এতে করেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন- সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রেষণে কর্মরত বিচারিক কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।[৩৯] আবার এ ধরনের দ্বন্দ্বের কারণে বিচারকদের পদোন্নতি ও বদলির নীতিমালা এখনও চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি বলে উত্তরদাতাদের অভিমত।

বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি: দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে প্রকৃত অর্থে কার্যকরভাবে বিচার বিভাগ পৃথক করা সম্ভব হয়নি বলেও কিছু ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন যে, পৃথকীকরণের পূর্বে বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়গুলো সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে ছিল এবং বর্তমানেও তা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথা সরকারের অধীনে রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে অধস্তন আদালত ব্যবস্থার কার্যক্রম প্রভাবিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।[৪০] ফলে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রয়ে গেছে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে বিচারিক কর্মকর্তাদের মধ্যে যেকোনো একটি তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রভাবিত হওয়া বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মেরুকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

৪.৩ অবকাঠামো

দেশের বিভিন্ন এলাকার অধস্তন আদালতগুলোর জন্য নির্ধারিত আদালত প্রাঙ্গণ ও আদালত ভবন রয়েছে যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর জন্য পৃথক অবকাঠামো নির্মাণ অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি জেলায় ৮-১০ তলা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং ১৭টি জেলায় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন এবং উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া, ২৭টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে।[৪১] তবে কিছু এলাকায় সিজেএম ভবন নির্মানের কাজ এখনো শুরু হয়নি। আদালত ভবন সংকটের কারণে ১৭০ জন বিচারককে এজলাস ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে।[৪২]

ভবন ও কক্ষ ঘাটতি: এ গবেষণায়ও দেখা গেছে যে গবেষণার আওতাধীন অধস্তন আদালতগুলোর অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার অর্ন্তভুক্ত অধিকাংশ এলাকায় দেখা গেছে যে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ এখনো শুরু হয়নি বা শুরু হলেও এখনো নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি বা শেষ হলেও এখনো সে ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়নি। গবেষণার আওতাধীন ১৮টি এলাকার মধ্যে ৭টিতে নতুন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ৬টিতে এখনো শুরু হয়নি, ৫টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং সেগুলোতে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া গবেষণার আওতাধীন একটি এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য আলাদা ভবন তৈরি সম্পন্ন হলেও জজ আদালত থেকে তা দূরে অবস্থিত হওয়ায় আইনজীবীরা সেখানে আদালতের কার্যক্রম শুরু করতে অসম্মতি জানিয়েছেন। এই এলাকাগুলোতে পৃথক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন না থাকায় এই আদালতগুলোকে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভবনের রুম বা কক্ষে কার্যক্রম পচিালনা করতে হচ্ছে যা অনেক ক্ষেত্রেই বিচারিক কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী নয়। একইভাবে গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, কিছু এলাকায় মহানগর দায়রা জজ ও চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য পৃথক ভবন নেই এবং এই আদালতগুলোকেও অন্যত্র কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। যেমন, একটি এলাকায় দেখা গেছে যে, সেখানে নতুন চীফ

[৩৯] সুপ্রীম কোর্টের আদেশ: ১৭ বিচারকের বিদেশ যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ মে, ২০১৭, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1189781/

[৪০] এখনো পৃথক হয়নি বিচার বিভাগ চলছে দ্বৈত শাসন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ২০১৬,

[৪১] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭: আইন ও বিচার বিভাগ, http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

[৪২] জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬: প্রধান বিচারপতির বক্তব্য

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের কার্যক্রম শুরু হলেও উক্ত ভবনের কিছু কক্ষ মহানগর দায়রা জজ আদালত ও চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ফলে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিজস্ব স্থান সংকুলানে ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে। এছাড়া সময় ও বিষয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন আদালত (যেমন- ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত ইত্যাদি) সৃষ্টি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসব আদালতের জন্য পৃথক আবকাঠমো সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি। এছাড়া আরও দেখা গেছে যে, বিদ্যমান আদালত ভবনগুলোর (নতুন ভবন ব্যতীত) বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা বা স্যাঁতসেঁতে যেখানে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আদালতগুলোতে কক্ষ সংকট রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে জেলা ও দায়রা জজ আদালতগুলোর জন্য আলাদা ভবন থাকলেও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা অন্যান্য বিশেষ আদালতের জন্য কক্ষ বরাদ্দের ফলে সেগুলোতে স্থানাভাব বা কক্ষের সংকট তৈরি হয়। এই কক্ষ সংকটের কারণে অনেক আদালতেই বিচারকের সংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এজলাস কক্ষ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই জন বিচারককে একটি এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হয়। এক্ষেত্রে দিনের প্রথম ভাগে একজন এবং দ্বিতীয় ভাগে অপরজন বিচারক একটি এজলাস ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করেন। বিচারকদের ব্যক্তিগত চেম্বার বা খাস কামরার ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। গবেষণার আওতাধীন ১৮টি এলাকার মধ্যে ১৭টিতেই দেখা গেছে যে কোনো না কোনো আদালতে এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে কক্ষ সংকটের কারণে ভবনের বারান্দায় এজলাস তৈরি করে বিচার কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। এজলাস কক্ষ ভাগাভাগি করার ফলে একজন বিচারক তার পুরো কর্মঘন্টার সর্বোচ্চ সময় বিচার কার্যে ব্যয় করতে পারেন না। কারণ তাকে পরবর্তী বিচারকের জন্য এজলাস ছেড়ে দিতে হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত বা খাস কামরায় বিচারকগণ নানা ধরনের প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজ করে থাকেন। যেমন- রায় লেখা, রায়ের ডিকটেশন দেওয়া, জেরা করা, জবানবন্দি নেওয়া ইত্যাদি। ব্যক্তিগত বা খাস কামরা শেয়ার করার ফলে এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রেও ব্যাঘাত ঘটে। দেখা যায় যে, একই কক্ষে একই সময়ে একজন বিচারক ১৬৪ ধারায় আসামির জবানবন্দী গ্রহণ করছেন এবং অপর বিচারক অন্য কাজ করছেন - এসকল ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদন করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, কিছু ক্ষেত্রে এজলাস হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষগুলো অত্যন্ত অপরিসর এবং আলো বাতাস চলাচলের অনুপযোগী ফলে গরমের সময় এবং ভীড়ের কারণে বিচার কার্য পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া সেগুলোতে প্রয়োজনীয় বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না এবং অনেক সাক্ষী এবং আইনজীবীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বা বিচারপ্রার্থীদের আদালত কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা মামলার বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গরূপে অবগত হতে পারেন না।

বক্স-২: এজলাস সংকট এবং বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তি

তথ্যদাতাদের মতে, এজলাস সংকটের বিচার প্রার্থীর ভোগান্তি, বিচারকের কর্ম সম্পাদনে অসুবিধা সৃষ্টি, দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- একজন বিচারপ্রার্থী সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হয়ত দূর প্রান্ত থেকে ঐ আদালতে আসেন বা অনেক খরচ করে সাথে সাক্ষী নিয়ে আসেন। কিন্তু দেখা যায় যে, আদালতের সময় স্বল্পতার (শেয়ারকৃত এজলাস হওয়ার কারণে উক্ত বিচারকের নেমে যাওয়ার সময় হয়ে যায়) কারণে উক্ত বিচারপ্রার্থীর মামলার বা সাক্ষীর শুনানী করা সম্ভব হয় না এবং উক্ত মামলার একটি পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। আবার দিনের দ্বিতীয় ভাগের আদালতে যে সাক্ষীর শুনানী হয় তাকে হয়ত সকাল থেকে অপেক্ষা করে চলে যেতে হয়। ফলশ্রুতিতে মামলাটি দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে যায়। এছাড়া বিচারপ্রার্থীর ঐ দিনের যাতায়াত, খাওয়ার খরচ, উকিল খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ হলেও বিচার প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ পড়েই থাকে। এতে করে মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আদালতের রেকর্ডরুম, মালখানায় স্থান সংকট: আদালতের অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষগুলোতেও স্থান সংকট রয়েছে এবং আদালতের বিভিন্ন সেকশনগুলোকে কক্ষ ভাগাভাগি করতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রাখার স্থানের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন আদালতের রেকর্ডরুম, মালখানায়ও স্থান সংকট রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভবন পুরোনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং সেগুলোতে পোকা-মাকড়ের (উইপোকা) উপদ্রব রয়েছে। ফলে আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ বিষয়ে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, রেকর্ড রুমের মধ্যে বৃষ্টির পানি পড়ে, ফলে পলিথিন দিয়ে কাগজ মুড়িয়ে রেকর্ডগুলো রাখতে হয়। তাছাড়া, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মালখানার এবং পুলিশের অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা এবং কোথাও কোথাও

বক্স ৩: রেকর্ড কক্ষ সংকট

গবেষণায় দেখা যায় একটি এলাকার মালখানা কালেক্টরের বিল্ডিংয়ে ভাঙ্গা একটি রুমে রয়েছে। কিন্তু রুমের স্থান এবং অবস্থা এতটা খারাপ যে যথাযথভাবে মাল রাখা সম্ভব হয় না এবং সেখান থেকে আলামত খুঁজে বের করা অনেক কষ্টসাধ্য। তথ্যদাতাদের মতে অনেক সময় মালখানার জন্য জায়গা না থাকার ফলে আলামত থানায় ফেলে রাখতে হয় এবং সেখান থেকে অনেক কাগজপত্র নষ্টও হয়ে যায়।

একবারেই জায়গা না থাকায় কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

অন্যদিকে জিআরও'রা ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে পেশকারের কাজ করেন। তারা পুলিশ বিভাগের অধীনে হলেও সবসময় আদালতে অবস্থান করেন এবং তারা কগনিজেন্স কোর্টের উকিল, পেশকার ও রাষ্ট্রপক্ষের কাজে সহায়তা করেন। আদালতে তাদের বসার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অপ্রতুলতা রয়েছে।

বিচারপ্রার্থীদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা: পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, কোনো এলাকার আদালত প্রাঙ্গণেই বিচারপ্রার্থীদের বসার জন্য কোনো সুব্যবস্থা অর্থাৎ কোনো ক্লায়েন্ট শেড বা উইটনেস শেড নেই। কিছু কিছু এলাকার আদালত কক্ষের সামনে কিছু বেঞ্চ রাখা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে অধিকাংশ বিচারপ্রার্থীকে আদালত প্রাঙ্গণেই বিভিন্ন স্থানে (আদালতের বারান্দা, খোলা মাঠ, গাছের তলায়, হোটেল, দোকান, আইনজীবীর চেম্বার ইত্যাদি) অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া আদালতগুলোতে সেখানে বিচারপ্রার্থীদের জন্য শৌচাগারের অপ্রতুলতা রয়েছে এবং বিদ্যমানগুলোর অবস্থাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এছাড়া নারীদের জন্য পৃথক কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা কোথাও দেখা যায়নি। এমনকি তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক এলাকায় নারী বিচারকদের জন্যও আলাদা শৌচাগার নেই। আবার অনেক এলাকায় শৌচাগার তালাবদ্ধ করে রাখতে দেখা গেছে।

মাতৃদুগ্ধ দান ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার ঘাটতি: কয়েকটি এলাকার আদালতে নারী বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে একটি কক্ষকে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। আবার কোনোগুলোতে প্রয়োজনীয় বসার ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে আদালতগুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা ব্যবস্থা (র‍্যাম বা অন্যান্য) পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া আরো দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে লিফটের ব্যবস্থা নেই বা আদালতের জন্য নতুন ভবন তৈরি হলেও লিফট এখনো অচল রয়েছে। কিছু এলাকায় দেখা যায় যে, দোতলা থেকে লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে যা প্রতিবন্ধীদের জন্য সহজে ব্যবহার উপযোগী নয়।

আইনজীবীদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা: কিছু ক্ষেত্রে আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা রয়েছে। কয়েকটি এলাকায় দেখা গেছে যে, আইনজীবী সমিতির ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আইনজীবীদেরকে আদালত প্রাঙ্গণে ছাপড়ার নিচে বসে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হয়। তথ্যদাতাদের মতে, আইনজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাদের বসার স্থান বাড়ছে না। আইনজীবীদের সহকারি বা মুহুরীদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। একইভাবে অনেক এলাকায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বসার স্থানেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। দেখা গেছে যে, বারান্দার এক অংশে হার্ডবোর্ড দিয়ে ঘিরে সেখানে কাজ চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিচারক ও কর্মচারীদের আবাসন ঘাটতি: অনেক ক্ষেত্রেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের আবাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কোয়ার্টারগুলোর মান ও অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় বিচারকগণ সেগুলোতে থাকতে বেশি উৎসাহিত বোধ করেন না। তথ্যদাতাদের মতে, সরকারি আবাসনে থাকার জন্য মাসে বেতনের যে পরিমাণ অংশ কেটে নেওয়া হয় তার থেকে কম ভাড়ায় তারা আরও ভালো বেসরকারি আবাসনে থাকতে পারেন। তবে বেসরকারি আবাসনে থাকার ফলে তাদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। এছাড়া বেসরকারি আবাসনে থাকার ফলে বিচারকদের সাধারণ জনগণের সাথে মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, আদালতের কর্মচারীদের আবাসনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। তাদের জন্য অধিকাংশ এলাকায় আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং কিছু এলাকায় থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

৪.৪ লজিস্টিকস

প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি: অধস্তন আদালতে অবকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও (আসবাবপত্র, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফরম, যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ হওয়ার পরও আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে আদালতে বিদ্যমান আসবাবপত্র অবস্থা জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপোযোগী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে এজলাস কক্ষেও চেয়ারের অপ্রতুলতা রয়েছে ফলে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় অনেকের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারির অভাবে নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। দেখা গেছে যে, মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ও রেকর্ড মাটিতে রাখা হয় ফলে নথি নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। আরও দেখা গেছে যে, আদালতগুলোতে কম্পিউটার স্বল্পতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটার পুরনো হওয়ার কারণে বিকল ও ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে যায় এবং এগুলো মেরামতে সময় লাগে। ফলে আদালতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রিন্টার ও প্রিন্টারের কালি বা টোনারেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। অন্যদিকে অনেক

ক্ষেত্রে রায় লেখার জন্য ব্যবহৃত সাদা কাগজ ও নীল কাগজের অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়া অধস্তন আদালতে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করতে হয়, যেমন- ওয়ারেন্ট ফরম, সমন ফরম প্রভৃতি। এই ফরমসগুলো সরকারের ফরমস অ্যান্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট সরবরাহ করার কথা থাকলেও বিভাগটি চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে পারছে না।[৪৩]। একজন তথ্যদাতার মতে, "ফরমটাতো সরকার সাপ্লাই দেয়, ওটার স্বল্পতা সব জায়গাতেই আছে। আমাদের স্টাফরা যদি নিজেরা টাকা পয়সা উঠাইয়া ওদের ওখানে কিছু দেয়, তাহলে ফরম বেশি করে আনে, চালাক আছে পেশকার টেশকার ওরা ম্যানেজ করে।"

ইন্টারনেট সুবিধার ঘাটতি: অনেক ক্ষেত্রে আদালতে ইন্টারনেট সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। সকল জেলা জজসহ এলাকার প্রধান আদালতগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও সব আদালতে বা বিচারককে এই সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যানবাহন ঘাটতি: আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে বিচারকদের অফিসে আনা নেওয়ার জন্য যানবাহনের ঘাটতি রয়েছে। যানবাহনের স্বল্পতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের গণ পরিবহন ব্যবহার করতে হয়। যেমন- অতিরিক্ত জেলা জজদের মৃত্যুদন্ড আরোপযোগ্য অপরাধের বিচার করে থাকেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের গণ পরিবহন ব্যবহার করতে হয়। তথ্যদাতাদের মতে, বিচারিক কর্মকর্তাদের গণ পরিবহনে যাতায়াত করতে হলে তা নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৪.৫ আর্থিক বরাদ্দ

অধস্তন আদালত থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা না থাকা: প্রতি অর্থবছরে অধস্তন আদালতের বাজেট আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়। জাতীয় বাজেটে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটে দেশের সকল অধস্তন আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (আইন কমিশন, জাটি, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ইত্যাদি) ও আইন ও বিচার বিভাগের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই বাজেট থেকে জেলার আদালতগুলোর জন্য অর্থ প্রেরণ করা হয়। আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ অধস্তন আদালতের জন্য বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড় করে থাকে। মন্ত্রণালয় এই বাজেট দেশের বিভিন্ন আদালতগুলোতে আদালতের শ্রেণী ও চাহিদা অনুযায়ী বন্টন করে। এই বাজেট বিভিন্ন খাত অনুযায়ী বিভক্ত থাকে। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধস্তন আদালতগুলো থেকে তাদের নিজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে অর্থ বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা নেই বা আদালত কর্তৃপক্ষ এরূপ চাহিদা কখনো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন না। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, অর্থবছরের কোনো সময়ে কোনো খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হয়ে গেলে অধস্তন আদালত থেকে মন্ত্রণালয়ের কাছে আবার উক্ত খাতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করতে হয় এবং মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী বাজেট প্রেরণ করে। এতে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনে কিছু সময়ক্ষেপণ হয়।

অধস্তন আদালতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দের ঘাটতি: এ গবেষণায় দেখা গেছে যে, অধস্তন আদালতগুলোতে বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, মন্ত্রণালয় থেকে বাৎসরিক যে বাজেট পাঠানো হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং প্রায়শই কিছু খাতভিত্তিক (যেমন- লজিস্টিকস, যানবাহন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বাজেট শেষ হয়ে যাওয়ায় আদালতগুলোকে মন্ত্রণালয়ের কাছে কন্টিনজেন্সি বাজেট চাইতে হয়। কোনো কোনো এলাকায় কম্পিউটার ক্রয় এবং মেরামত করার বাজেটে ঘাটতি রয়েছে। আবার কোনো কোনো এলাকায় কম্পিউটার আছে কিন্তু প্রিন্টার, টোনার এবং ইন্টারনেট খরচের জন্যে পর্যাপ্ত বাজেট নেই। তথ্যদাতারা উল্লেখ করেছেন যে, প্রিন্টারের কালি শেষ হয়ে গেলে বাজেট ঘাটতির জন্য স্বল্প মূল্যের টোনার ব্যবহার করতে হয় এবং এ ধরনের টোনার দিয়ে প্রিন্ট করার ফলে কিছুদিন পরই কাগজ থেকে কালি উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। একজন আদালত কর্মচারীর মতে, "ধরেন আমার টেবিলের পায়া যদি ভেঙ্গে যায় আমি ইট কাঠ দিয়ে টেবিলের কাজটা চালাতে পারি। কিন্তু আমার কম্পিউটারের টোনার না থাকলেতো আমি কোনো ভাবেই কাজটা করতে পারবো না। ১টা ভালো টোনার মোটামুটি ৫-৭ হাজার টাকার নিচে না। বাজেটের অভাবে খারাপ টোনার কিনতে হচ্ছে।" এছাড়া আদালতের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম- এর অপ্রতুলতা রয়েছে। ফরমগুলো ঠিকমতো পাওয়া যায় না বলে ফটোকপি করে কাজ চালাতে হয়। এছাড়া প্রতিমাসে সব কর্মকর্তা নিয়ে (পুলিশ, জেলা প্রশাসন) মিটিং করার কথা থাকলেও

বক্স ৪: বাজেট সংকট এবং দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি

অনেক সময় বাজেট না থাকায় কর্মচারীরা নিজ ব্যবস্থাপনায় এগুলো দোকান থেকে ফটোকপি করে সরবরাহ করে। কর্মচারীরা বিভিন্ন কাজের অজুহাতে আইনজীবী, মুহুরী ও বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নেয় এবং সে টাকার কিছু অংশ দিয়ে এসকল ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া সমন জারির জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটও অত্যন্ত কম এবং বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলশ্রুতিতে সমন জারি করার জন্য বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নিতে হয়। এভাবে বাজেট অপ্রতুল হওয়ার কারণে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

[৪৩] জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬: প্রধান বিচারপতির বক্তব্য

অনেক ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতির জন্য তা করা যায় না। বাজেট ঘাটতির জন্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের আয়োজনও যথাযথভাবে করা যায় না।

৪.৬ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

জনবল ঘাটতি - বিচারক: দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বিপুল সংখ্যক মামলা চলমান রয়েছে এবং প্রতিদিন এই মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই বিপুল সংখ্যক মামলার কর্মভার পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে অধস্তন আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারকের ঘাটতি রয়েছে এবং কাজের চাপের তুলনায় অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীর সংখ্যাও অপ্রতুল। মামলার সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে জনবলের সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। আবার সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালত সৃষ্টি করা হলেও সে আদালতগুলোর (ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদি) জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছেন।[৪৪]

সারণি-৪.৬.১: বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বিচারক সংখ্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ[৪৫]

নির্দেশক	বাংলাদেশ	ভারত	যুক্তরাজ্য	অস্ট্রেলিয়া	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র
জনসংখ্যার অনুপাতে বিচারক (প্রতি ১০,০০০০০)	১০	১৮	৫১	৪১	৭৫	১০৭

২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালত পর্যায়ে বিচারকের অনুমোদিত পদসংখ্যা ১৬৫৫; এর মধ্যে ৩৮৭টি পদ শূন্য রয়েছে; কর্মরত বিচারক সংখ্য ১২৬৮।[৪৬] ২০১৬ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২৭ লক্ষ ১২ হাজার ১২১টি। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা ২১৩৮টি। অর্থাৎ একজন বিচারকের হাতে দু'হাজারেরও বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে এবং এর সাথে নতুন মামলাও যুক্ত হচ্ছে ফলে মামলার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ব্যাপক কর্মচাপ সৃষ্টি করছে। অপরদিকে অবশিষ্ট ১২৬৮ জন বিচারকের সবাই বিচারকার্যে নিয়োজিত নন। আবার কিছু সংখ্যক বিচারক সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ে কর্মরত রয়েছেন।

গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, গবেষণার আওতাভুক্ত জেলাগুলোর ৬২১টি আদালতে ১১৪ জন বিচারকের সাময়িক ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো আদালতের বিচারক বদলি হয়ে গেছেন কিংবা অবসর গ্রহণের কারণে চলে গেছেন কিন্তু উক্ত পদগুলোতে সাথে সাথে নতুন বিচারকদের পদায়ন না করায় পদগুলো সাময়িকভাবে শূন্য রয়েছে। এছাড়া আরও দেখা যায় যে, কিছু আদালতের বিচারকরগণ প্রশিক্ষণ ও ছুটিতে (মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি) থাকায় উক্ত পদগুলোও সাময়িকভাবে খালি রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন বিচারককে এ ধরনের আদালতগুলোর ভারপ্রাপ্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একজন বিচারককে একাধিক আদালতের কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে উক্ত আদালতগুলোর মামলা পরিচালনায় বিলম্ব ঘটে এবং বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

জনবল ঘাটতি - আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী: আদালতের কর্মভার অনুযায়ী কর্মচারীদের সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মচারী কম রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৮টি এলাকার সবকটিতেই সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে এবং আদালতগুলোতে ৫৭৯ জন সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কম রয়েছে। বিভিন্ন পদে কর্মচারী (যেমন- স্টেনোগ্রাফার, অ্যাকাউন্টেন্ট, জারিকারক ইত্যাদি) সংখ্যা কম বা পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া আদালতগুলোতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। কর্মচারীদের অনেককেই একাধিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

[৪৪] যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ১০৭ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন এবং ভারতে ১৮ জন বিচারক রয়েছেন।

[৪৫] প্রধান বিচারপতির বক্তব্য: জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬, http://www.supremecourt.gov.bd/resources/contents/CJ_Speech_National_Judicial_Conferrence_2016-Inaugural_Session.pdf (Accessed on 27 October 2017)

[৪৬] প্রাগুক্ত

দেখা গেছে যে, গবেষণার আওতাধীন ৯টি এলাকায় বিভিন্ন আদালতে ১৭ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ ফাঁকা রয়েছে। এছাড়া গবেষণার আওতাধীন একটি এলাকায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, ফৌজদারী ট্রায়াল কোর্টের জন্যে বেঞ্চ সহকারি থাকলেও কগনিজেন্স কোর্টেগুলোর জন্যে পৃথক কোনো বেঞ্চ সহকারির পদ নেই এবং ট্রায়াল কোর্টের বেঞ্চ সহকারিকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। আবার দেখা যায়, কোনো আদালতে মামলার সংখ্যার তুলনায় জারিকারকের সংখ্যা কম থাকে এবং মামলার সমন জারি করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে কিছু ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে সমন জারির জন্য অর্থ নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। রায়ের নকল উত্তোলনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়।

বক্স ৫: আদালতের অনানুষ্ঠানিক কর্মচারী "উমেদার" এবং দুর্নীতির ঝুঁকি

অনেক ক্ষেত্রে আদালতের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীরা অতিরিক্ত মাত্রায় কাজের চাপে ভাড়াক্রান্ত। কিছু ক্ষেত্রে কাজের চাপ সামলানোর জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মচারী কর্তৃক "উমেদার" যুক্ত করা হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে কর্মচারীরা বিচারপ্রার্থী বা আইনজীবীদের নিকট থেকে যে ঘুষ বা নিয়ম বর্হিভূত অর্থ নেয় তার কিছু অংশ এই উমেদারদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু আদালতের মতো সংবেদনশীল জায়গায় যেখানে নিয়মিত অনেক সংবেদনশীল নথি ব্যবস্থাপনা করতে হয়, সেখানে এ ধরনের উমেদার জড়িত হলে বিভিন্ন ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। এভাবে কিছু ক্ষেত্রে জনবল ঘাটতির কারণে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতভেদে কর্মচারী পদায়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। সহকারি জজ এবং সিনিয়র সহকারি জজদের স্টেনোগ্রাফার নেই। কিন্তু একই পদের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের স্টেনোগ্রাফার রয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীর অভাব রয়েছে।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মামলার সকল কার্যাদি সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারক, আদালতের কর্মচারী ও আইনজীবীদের নানা ভূমিকা রয়েছে এবং তারা যত ভালোভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন মামলাটি তত সফল হবে। এজন্য তাদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, বিচারক, আদালতের কর্মচারী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও অন্যান্য আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জাটি) রয়েছে। প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন ধরনের (রিফ্রেশার কোর্স, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স, এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স[৪৭] ইত্যাদি) কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়[৪৮]। এছাড়া সুপ্রীম কোর্ট, মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীরাও কিছু ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। তবে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে জাটির নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা (অবকাঠামো, জনবল, বাজেট) রয়েছে। ফলে একসাথে ৪৮ জনের বেশি অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় না।।

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, জাটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে বিশেষায়িত আইনের (যেমন- হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়াল, সাইবার আইন ইত্যাদি) ওপর প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেতে এক বছরের অধিক সময় লেগে যায়। এছাড়া তথ্যদাতারা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ অ্যাকাডেমিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া ট্রেনিং-এ আরো ভালো রিসোর্স পারসনের ব্যবস্থা করা, এবং খেলাধুলা এবং অন্যান্য কারিকুলামের ব্যবস্থা করার কথাও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তাদের মতে, এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। তথ্যদাতাদের মতে, "প্রশিক্ষণের কোর্সগুলো আরো আকর্ষণীয় করার সুযোগ রয়েছে"। অন্যদিকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে, কখনো কখনো এক ব্যক্তি এক বছরে একাধিক প্রশিক্ষণ পান আবার অনেকে দীর্ঘদিন কোনো প্রশিক্ষণই পান না এবং যাদের মন্ত্রণালয়ে ও জাটিতে পরিচিত লোকজন আছে তারাই এ ধরণের প্রশিক্ষণগুলো বেশি পেয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

"প্রশিক্ষণ সন্তোষজনক নয়। ১৫০০ বিচারক ১টা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে ৪০ জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ অনেকে পান না। দুই তিন বছর চাকুরি করতে হয় ট্রেনিং ছাড়া।"-- একজন উত্তরদাতা

---

[৪৭] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-১৫, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

[৪৮] প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

অন্যদিকে আদালতের কর্মচারীদের জন্য জাটিতে খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। স্থানীয়ভাবে কর্মচারীদের জন্য বছরে একটি কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে বিচারকগণ তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেটিও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। একইভাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্যও জাটিতে খুব কম সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এছাড়া বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শুধুমাত্র পিপি ও জিপিদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অন্যান্য পর্যায়ের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের (যেমন- এপিপি বা এজিপি) জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত বিচারকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের সংখ্যার তুলনায় আদালতের কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা অত্যন্ত কম।[৪৯] যেমন- ২০১৬ সালে বিচারকদের জন্য ১০টি এবং কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য যথাক্রমে দু'টি ও একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

চিত্র-৪.৬.১: বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জাটি) আয়োজিত বিভিন্ন অংশীজনের প্রশিক্ষণ কোর্সের বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান

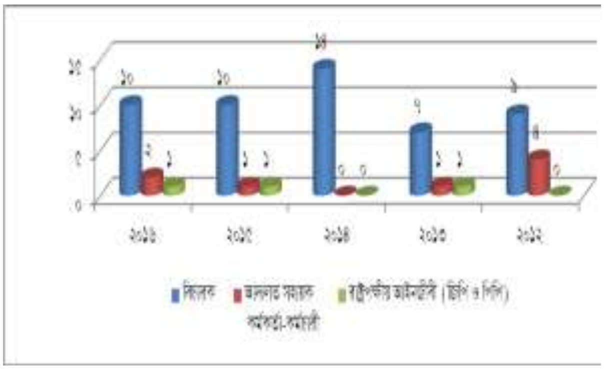

চিত্র-৪.৬.২: বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জাটি) আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা

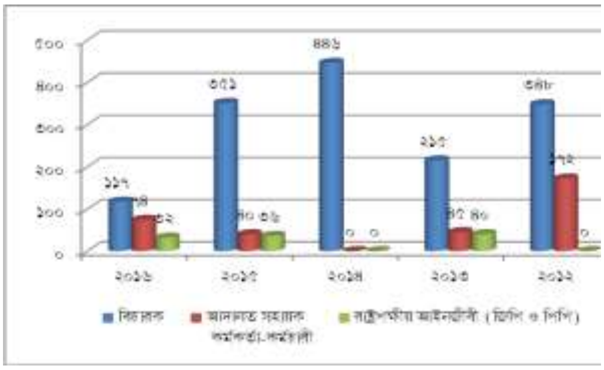

অপরপক্ষে, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। কিছু ক্ষেত্রে বার কাউন্সিল থেকে কিছু বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের (যেমন- 'ক্যাননস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট, এটিকেট এন্ড এডভোকেসী-হাউ টু মুভ টুওয়ার্ডস দ্যা কোর্ট' এর উপর অনুষ্ঠিতব্য ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইত্যাদি) আয়োজন[৫০] করা হলেও সার্বিকভাবে নতুন আইনজীবীদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে নতুন আইনজীবীরা স্থানীয় বারে যোগদানের সময় তাদের একটি ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয় যা স্থানীয় বার সমিতি আয়োজন করে থাকে।

নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ - বিচারক: দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও জনগণের মাঝে আস্থা সৃষ্টির জন্য বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়োগে স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা মূলত নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। আবার বিচারক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে।[৫১] বর্তমানে বাংলাদেশের অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ২০০৭ সালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭[৫২] এর মাধ্যমে গঠিত হয়। এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা। অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পাদন করে আইন ও বিচার বিভাগ। আইন ও বিচার বিভাগ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ সৃজন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই এবং প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা-পরিচালনার মাধ্যমে উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ ও রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে। পরবর্তীতে আইন ও বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসাপেক্ষে সরকারি আদেশ (গেজেট) জারি করে।

---

[৪৯] http://jati.judiciary.org.bd/jati-training/training-courses Accessed on 2 November 2017

[৫০] "বার কাউন্সিলের লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২৪ সেপ্টেম্বর ", http://lawyersclubbangladesh.com/details.php?id=9151

[৫১] Akkas, Sarkar Ali (2004) "Appointment of Judges: A Key Issue of Judicial Independence," ***Bond Law Review***: Vol. 16: Iss. 2, Article 8. P 201; Available at: http://epublications.bond.edu.au/blr/vol16/iss2/8

[৫২] বিস্তারিত দেখুন http://www.bjsc.gov.bd/ access on 21st June 2017

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারি নিয়োগ ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগ থাকলেও বাংলাদেশের অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে।[৫৩] নিচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে ফল ঘোষণা করতে প্রায় দু'বছর বা তারও অধিক সময় লেগেছে।

সারণি-৪.৬.২: বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়োগ সম্পন্ন করতে ব্যয়িত সময়

বিজেএস	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
সময় (মাস)	৬	২০	২৬	২৮	২৮	২৯

অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির জন্য ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সময়ে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ,পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরি, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-বিধান এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়ন করা হয়। আইন ও বিচার বিভাগ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী বিচারক বদলি ও পদোন্নতির সরকারি আদেশ জারি করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আইন ও বিচার বিভাগ হতে কোনো বিচারকের বদলির প্রস্তাব হাইকোর্টের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিএ) কমিটির কাছে পাঠানো হয়। পরবর্তিতে, জিএ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আইন ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বদলির সরকারি আদেশ জারি করেন। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপঃ

- ***বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি:*** বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। এটি এখোনো না হওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। একজন বিচারকের নির্দিষ্ট কর্মস্থলে নূন্যতম তিন বছর[৫৪] থাকার বদলি নীতি নির্ধারণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হয় না বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে এর ফলে বিচারকদের মধ্যে বছরের যে কোনো সময় বদলি হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়।

- ***বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা:*** বদলি ও পদোন্নতির আদেশ জারির পূর্বে আইন ও বিচার বিভাগ প্রস্তাবিত তালিকা সুপ্রীম কোর্টের নিকট পরামর্শের জন্য প্রেরণ করে। এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের জিএ কমিটির নিয়মিত সভা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে আপত্তি প্রদান করলে তা পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রণালয় পুনরায় বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার তথ্যদাতাদের মতে, অনেক সময় সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দ্বিমত থাকলে বিষয়টি সমাধানে কিছু সময়ক্ষেপণ হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জেলা জজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে ও সঠিক সময়ে সুপ্রীমকোর্টে পাঠানো হয় না। অনেক সময় জেলা জজ পরিবর্তন হয়ে গেলে নতুন জেলা জজ এসে গোপনীয় অনুবেদন লেখেন। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিচারককে অল্পসময় পর্যবেক্ষণে সঠিক মূল্যায়নের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তেমনি পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, একজন বিচারক বদলি হওয়ার পর উক্ত পদে নতুন বিচারক পদায়নেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। পর্যবেক্ষণেও দেখা গেছে যে একটি এলাকার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আদালতে পূর্ববর্তী বিচারক বদলি হওয়ার পর তিন মাস অতিবাহিত হলেও নতুন বিচারকের পদায়ন হয়নি।

- ***বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম:*** তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদবির না শোনায় বিচারকদের বদলি ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- শাস্তি হিসেবে তাৎক্ষণিক বদলি, কম নম্বর প্রদান ইত্যাদি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বদলির জন্য প্রভাব বিস্তার বা তদবির পরিলক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, রাজনৈতিক যোগাযোগ বা প্রভাবের মাধ্যমে পছন্দনীয় স্থানে বদলি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

---

[৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬, সহকারি জজ নিয়োগে সময় বেশি লাগছে বিসিএসের চেয়েও

[৫৪] মাসদার হোসেন মামলার রায়ে বলা হয়েছে, বিচারকদের নির্দিষ্ট মেয়াদে তার কর্মস্থলে থাকা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

- ***পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের বেতন না পাওয়া:*** তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ওপরের পদ শূন্য হওয়ায় বিচারকগণ তুলনামূলক কম সময় এক পদ থেকে অন্য পদে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। কিন্তু জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ অনুযায়ী কোনো একটি পদে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্তিতে বিচারকগণ পরবর্তী গ্রেডে বেতনপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হবেন[৫৫]। এ বিধানের কারণে অনেক বিচারক পদোন্নতি পেলেও পূর্ববর্তী গ্রেডেই বেতন ভাতাদি পান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ - আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী: অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থানীয়ভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আদালতে পদ সৃজনসহ শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী নিয়োগবিধি অনুযায়ী[৫৬] কর্মচারি নিয়োগে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করে এবং সর্বশেষে অনুমোদনটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়পত্র প্রদান করে[৫৭]। মাঠ পর্যায়ে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট আদালতের জেলা জজের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। নিয়োগ কমিটি কর্তৃক শূন্য পদের ভিত্তিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং লিখিত, মৌখিক ও কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অধস্তন আদালতে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগে তদবির, নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন, বিচারিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও বিচারিক সার্ভিসের সুবিধা না পাওয়াসহ বিভিন্ন প্রকার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, নিয়োগের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নিয়োগ প্রদানের জন্য তদবির আসা এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

> "স্টাফদের নিয়োগ কমিটিতে ছিলাম, চাপ থাকে। আত্মীয়তার চাপ থাকে। তদবির দুই রকমের হয়, একটা আত্মীয়তার চাপ আরেকটা ফিনান্সিয়াল। আর উমেদার ও স্টাফদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তো সহানুভূতি থেকেই যায়। নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান এবং জেলা জজের কাছে তদবির যায়। " - একজন তথ্যদাতা

এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব ও এলাকাভেদে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ম বহির্ভূতভাবে লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো জেলায় কর্মচারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোর্ট কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া যায়।

অধস্তন আদালতসমূহের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে এবং এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি হয়ে থাকেন। তবে কর্মচারীদের নিয়মিত বদলি হয় না। কর্মচারি বদলির ক্ষেত্রেও তদবির ও নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু বিশেষ আদালত (যে আদালতে মামলা বেশি বা নিজ এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ইত্যাদি, যেখানে দুর্নীতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে) বা শাখায় (নকল বিভাগ) পদায়ন পাওয়ার জন্য কিছু কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। এক্ষেত্রে, ১০ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার, অন্য জেলা থেকে নিজ জেলায় আসার জন্যও অনেক কর্মচারী আবেদন করেন এবং এ জন্য কোনো কোনো সময় নিয়মবহির্ভূত টাকা দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকার নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন হয়। আবার, এ ধরনের বদলির জন্য মন্ত্রণালয় এবং হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে অনুমতি নিতে হয় এবং সেজন্য ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়।

তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে, কিছু আদালত যেমন- ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল, বিভাগীয় বিশেষ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত ইত্যাদির কর্মচারীরা বদলি হন না এবং দীর্ঘদিন একই আদালতে কর্মরত থাকার কারণে বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের সাথে তাদের যোগসাজশ তৈরি হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এটি দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

---

[৫৫] বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬; এস.আর.ও নং ৯৭-আইন/২০১৬

[৫৬] The Typist (Ministries, Divisions and attached Departments) Recruitment Rules, 1978; the Stenographers and Steno-typists (Ministries, Divisions andattached Departments) Recruitment Rules, 1978; সাটলিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরীক পদের পদবি পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০

[৫৭] প্রাগুক্ত

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, সার্বিকভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ অত্যন্ত কম। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর্মচারী একই পদে কর্মজীবন কাটিয়ে দেন যা চাকুরী ক্ষেত্রে কর্মচারীদের মাঝে হতাশা তৈরি। এছাড়া পদোন্নতির জন্যও অনেক ক্ষেত্রে তদবির এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, বিচার বিভাগে সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জুডিসিয়াল সার্ভিসের কর্মচারী হিসেবে সুবিধা না পাওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। যেমন- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে বিচারকগণ বিচারিক ভাতা[৫৮] এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান কিন্তু কর্মচারীগণ এ ধরনের কোনো ভাতা বা সুযোগ সুবিধা পান না যা তাদের ভেতর এক ধরনের হতাশা তৈরি করে বলে উত্তরাদতারা জানিয়েছেন।

৪.৭ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগ

অধস্তন আদালতে সরকারের পক্ষ হতে মামলা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়। ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য পিপি (পাবলিক প্রসিকিউটর) এবং দেওয়ানি মামলা পরিচালনার জন্য জিপি (গভার্নমেন্ট প্লিডার) নিয়োগ দেওয়া হয়। জিপি/পিপি'র সহযোগিতার জন্য এক বা একাধিক অ্যাডিশনাল পিপি/জিপি এবং দুইয়ের অধিক এপিপি/এজিপি নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় চার হাজারেরও বেশি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কর্মরত রয়েছেন[৫৯]। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি/পিপি শাখা পিপি/জিপি নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, অভিযোগ তদন্ত, ভাতা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮[৬০]-এ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এলআর ম্যানুয়াল অনুযায়ী পিপি/জিপি নিয়োগে সর্বনিম্ন আইন পেশায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং এপিপি/জিপি নিয়োগে সর্বনিম্ন পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাকে যোগ্যতা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ: তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং মেধা ও অভিজ্ঞতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। গবেষণার পর্যবেক্ষণেও দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন পদে রয়েছেন। তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করেও নিয়োগ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

অপ্রতুল বেতনভাতা: তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বেতনভাতা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্তোষজনক নয়। একজন পিপি প্রতিদিন মামলা পরিচালনার জন্য ৩৫০ টাকা এবং এপিপি ১৬০ টাকা বেতন পান। অপরদিকে একজন জিপি মাসিক বেতন পান ১৫০০ টাকা এবং এজিপি বেতন পান ৭৫০ টাকা। এছাড়া বেতনভাতার বিল নিয়মিত পাওয়া যায় না বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিল পেতে এক থেকে দেড় বছর সময় অতিবাহিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৮ আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তি

বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনারস অ্যান্ড বার কাউন্সিল আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আইনজীবীদের সনদ প্রদানকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। এটি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বাংলাদেশের অ্যাটর্নী জেনারেল পদাধিকার বলে এর চেয়াম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগণ (সাতটি সাধারণ ও সাতটি আঞ্চলিক পদ) তিন বছরের জন্য আইনজীবীদের ভোটে নির্বাচিত হন। বার কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা তালিকাভুক্তি কমিটি গঠিত হয় যারা আইনজীবী তালিকাভুক্তিকরণ[৬১] প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করেন।

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিও আইন চর্চা করার অনুমতি পেয়েছেন। আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তির বিষয়েও অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলে নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যদাতারা আরও অভিযোগ করেছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক

[৫৮] বিচারকগণ তাদের মূল বেতনের সাথে ৩০ শতাংশ জুডিসিয়াল ভাতা পান এবং সিজিএম কোর্ট একমাস খোলা থাকার কারণে অতিরিক্ত ভাতা পান।
[৫৯] তথ্যসূত্র: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্ত)
[৬০] The Code of Criminal Procedure, 1898; article 492
[৬১] নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বার কাউন্সিলের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বার কাউন্সিল তাদের আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স বা সনদ প্রদান করে। এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইনজীবী কোনো জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আইন ব্যবসা করতে পারেন।

পর্যায়ের এবং ল' কলেজ আইন শিক্ষার সনদ প্রদান করেছে যা অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন নয়।[৬২] কিছু ক্ষেত্রে এরূপ ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরা আইন চর্চার সনদপ্রাপ্ত হয়ে আইন পেশায় যুক্ত হচ্ছেন যা কিছু ক্ষেত্রে সততার সাথে আইন চর্চায় ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে তথ্যদাতাদের অভিমত।

২০১৬ সালে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটির আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে দেয়া রায়ে হাইকোর্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা এবং আইনজীবীর সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক কিছু নির্দেশনা ও আদেশ দিয়েছেন। এ রায়ে বলা হয় যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো এখন থেকে নিজেরা সরাসরি এলএলবি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল (বিবিসি) ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির জন্য মেধা তালিকা করে দেবে। সেখান থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর 'ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' ছাড়া কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইন বিষয়ে অনার্স প্রোগ্রাম চালাতে পারবে না। বিদ্যমান প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিকে এ সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো ইউনিভার্সিটি এলএলবি কোর্স চালু করতে চাইলে আগেই 'ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' নিতে হবে। এই সার্টিফিকেট ছাড়া ইউজিসি আইন কোর্স চালানোর অনুমতি দিতে পারবে না। একইভাবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে (মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত) আইন বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য যাচাই বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনুমোদনহীন কোনো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ব্যতীত অন্য যে কোন ক্যাম্পাসে আইন বিষয়ে পরিচালিত প্রোগ্রাম/কোর্সে ভর্তি হলে উক্ত শিক্ষার্থীদের বার কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এল.এল.বি (অনার্স) কোর্সে ২৩ এপ্রিল, ২০১৪ সালের পূর্বে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বিগত ৫ বছরের ভর্তির তথ্য জমা দিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত তথ্য তালিকা জমা দিতে না পারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। বার কাউন্সিলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে দুই বছর মেয়াদী এল.এল.বি (পাস) কোর্স ডিগ্রীধারীদের বার কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না।[৬৩]

[৬২] "ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়", বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, টিআইবি, ২০১৪

[৬৩] প্রাইভেট ভার্সিটি সম্পর্কে হাইকোর্টের নির্দেশনা: বার কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া এলএলবি কোর্স নয়, *দৈনিক যুগান্তর*, ২৯ জুলাই, ২০১৬, https://www.jugantor.com/last-page/2016/07/29/48698/

পঞ্চম অধ্যায়
অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৫.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সহায়ক। কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা পরিমাপ করা যায় সময়মতো ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থাপনা দিয়ে। এক্ষেত্রে তথ্য উন্মুক্ততায় দুর্বল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করে[৬৪]। সাম্প্রতিক সময়ে আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- মামলার কজলিস্ট বা মামলার তালিকা আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং কিছু ক্ষেত্রে আদালত কক্ষের বাইরে টাঙ্গিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন আদালতে যাওয়ার দিক নির্দেশনা বা কক্ষ নির্দেশনা আদালত ভবনের দেওয়ালে লিখিতভাবে দেওয়া, আইনগত সহায়তা বিষয়ক বিলবোর্ড ইত্যাদি। গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতগুলোর তথ্যের উন্মুক্ততার চিত্র এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলো:

সিটিজেন চার্টার বা তথ্য বোর্ড না থাকা: গবেষণার আওতাধীন এলাকার আদালতগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোনো আদালত প্রাঙ্গণেই আদালতের সেবা বা মামলা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য সম্বলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার নেই। এছাড়া কোনো তথ্য কীভাবে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কেও কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

কক্ষ দিক নির্দেশিকার ঘাটতি: এ গবেষণার আওতাধীন ১৮টি এলাকার মধ্যে অধিকাংশ (১৪টি) আদালত প্রাঙ্গণ বা ভবনে বিচারপ্রার্থী বা সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন আদালতে যাওয়ার দিক নির্দেশনা বা কক্ষ নির্দেশনা দেওয়া নেই। অপরদিকে কিছু এলাকার (৪টি) আদালত প্রাঙ্গণে আদালতে যাওয়ার দিক নির্দেশনা বা কক্ষ নির্দেশনা রয়েছে।

তথ্য কেন্দ্র না থাকা: গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকার আদালতগুলোতে কোনো তথ্য কেন্দ্র দেখা যায়নি। তবে কিছু এলাকার নতুন আদালত ভবনে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে একটি অংশকে চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয়নি বা কার্যকর নয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি: তথ্য প্রদানের জন্য প্রত্যেক আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। তবে গবেষণার আওতাভুক্ত কোনো এলাকার আদালত প্রাঙ্গণ বা ভবনে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম সম্বলিত বোর্ড দেখা যায়নি। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল নন। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, তথ্য আইনের আওতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন খুব কম আসে। ফলে তথ্য প্রদানের রেজিস্ট্রার আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।

পুরোনো তথ্য ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে কিছু ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া মামলার নথি বা রেকর্ড সংরক্ষণে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া নথি হারিয়ে যাওয়া, বৃষ্টি বা পোকায় আক্রান্ত হয়ে নথি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে উত্তরদাতারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা: স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও জনমুখী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানো এবং কেন্দ্র অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন ও বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং এটুআই প্রোগ্রামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন[৬৫] নামক একটি ওয়েব পোর্টাল যাত্রা শুরু করেছে। এতে দেশের প্রত্যেক জেলার সকল আদালতসমূহের তথ্য রয়েছে। তবে গবেষণায় দেখা যায় যে, এ ওয়েব পোর্টালে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য (যেমন- মামলার পরিসংখ্যান) অনুপস্থিত রয়েছে। এছাড়া অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি (যেমন- বার্ষিক প্রতিবেদন, মামলার কার্যতালিকা) এবং কিছু তথ্য হালনাগাদকৃত অবস্থায় নেই।

---

[৬৪] H. Alvaro and L.Gaspar(2010) *"Access to Information and Transparency in The Judiciary, a Guide to good practices from Latin America"* Asociación por los Derechos Civiles (ADC),p9

[৬৫] http://www.judiciary.org.bd/

অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন না থাকা: প্রতিবছর অধস্তন আদালতগুলোর কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হলেও সকল আদালতের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অবস্থায় নেই। এছাড়া দেশের সকল আদালতের কার্যক্রম নিয়ে অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় না।

৫.২ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা

আদালতের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা এবং স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ গবেষণায় কিছু ক্ষেত্রে আদালতের বিচারক ও সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (আইনজীবী, রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী) জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিয়মিত অডিট বা আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়া: গবেষণার আওতাভুক্ত ১৮টি এলাকার মধ্যে ৮টি এলাকায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, তাদের নিয়মিত অডিট হয়। অপরদিকে বাকি ১০টি এলাকার তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আদালতগুলোতে নিয়মিত অডিট হয় না। কোনো কোনো আদালতে দীর্ঘসময় এ ধরনের অডিট না হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, তিন-চার বছর পর পর অডিট হয়। আদালতের আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শন করার নিয়ম আছে। কিন্তু এ ধরনের পরিদর্শন নিয়মিত বা প্রতিবছর হয় না। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের পক্ষে প্রতিবছর সকল আদালতের অডিট করা সম্ভব নয়। তারা শুধু ঝুঁকিপূর্ণ বা সংবেদনশীল ক্ষেত্রে অডিট করে থাকেন। এছাড়া অধস্তন আদালতগুলোর নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করাও হয় না।

বিচারকদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি: অধস্তন আদালতে বিচারকদের কার্যক্রম ও আচরণের জবাবদিহিতা[৬৬] নিশ্চিতে নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন- হাইকোর্টের বিচারক কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর), নিষ্পত্তিকৃত এবং অনিষ্পন্ন মামলার পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান, আদালতে জেলা জজের নেতৃত্বে ত্রৈমাসিক সভা, অধস্তন আদালতের বিচারকগণের বিচারিক ও প্রশাসনিক কাজের যথাযথ মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি। গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি বা তদারকি প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়।

অধস্তন আদালতের উপর তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতার অংশ হিসাবে প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণ বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অধস্তন আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন। প্রতিবছর দেশের অধস্তন আদালতগুলোর একাংশ হাইকোর্ট কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, এ ধরনের পরিদর্শন সকল জেলায় নিয়মিত বা প্রতিবছর হয় না। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, যখন হাইকোর্ট থেকে বিচারপতিগণ পরিদর্শনে আসেন তখন অধস্তন আদালতগুলোতে তুলনামূলকভাবে অধিক কর্মমুখর পরিবেশ (দেখা যায় বিচারকগণ আদালতেই বেশি সময় ব্যয় করেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সতর্ক অবস্থায় থাকেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে ইত্যাদি) বিরাজ করে।

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিচারকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের (এসিআর) ব্যবস্থা রয়েছে। এসিআর-এর মাধ্যমে বিচারকদের মামলা পরিচালনার মূল্যায়ন, আইনজীবীদের সাথে সম্পর্ক বা প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনের দক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হয় এবং জেলা জজ বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট আদালতের প্রধান বিচারক এই গোপনীয় অনুবেদন লেখেন। এ বিষয়ে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে এসিআর-এর মাধ্যমে এ মূল্যায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যায়। যেমন- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে (কোনো তদবির না শুনলে বা অন্য কোনোভাবে) এসিআর-এ তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে পদোন্নতিতে সমস্যা হয় এবং তাদের মধ্যে মানসিক ভীতি কাজ করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

---

[৬৬] বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বিধিমালা, ২০০৭-এ বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিচারিক সার্ভিসের সদস্যগণ সংবিধানের ১০৯, ১১৬, ১১৬ক অনুচ্ছেদ এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত হবেন। সার্বিকভাবে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন আদালতের তদারকি করে থাকেন। এছাড়া স্থানীয়ভাবে কোনো এলাকার জেলা ও দায়রা জজ তার অধীনে কর্মরত সকল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ সার্ভিসের অন্য সকল কর্মকর্তার, মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন সেশনস্ জজ তার অধীনে কর্মরত সকল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটসহ সার্ভিসের অন্য সকল কর্মকর্তার, জেলা ও দায়রা জজের সমপর্যায়ের বিচারক তার অধীনে কর্মরত সার্ভিসের অন্যান্য কর্মকর্তার এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন এলাকায় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার অধীনস্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রশাসনিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবেন। এছাড়া বিধিমালায় আরও বলা হয়েছে যে প্রশাসনিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা জারি করলে তা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ জেলাগুলোতে এই পর্যায়ের বিচারক অন্যান্য বিচারকদের তদারকির দায়িত্বে থাকেন।

এ গবেষণায় কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের নানা ধরনের নির্দেশনা অনুসরণ না করার এবং তা যথাযথভাবে তদারকি না হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুপ্রীম কোর্টের এ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও সার্কুলার রয়েছে। যেমন- নির্দেশনা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় এজলাসে না বসা, কর্মস্থল ত্যাগ করা, বৃহস্পতিবার দ্রুত কার্যালয় ত্যাগ করা ও রবিবারে দেরি করে আদালতে আসা ইত্যাদি।

অন্যদিকে বিচারকদের জন্য নির্ধারিত বিচারিক নীতিমালায়ও[৬৭] বিচারকদের জন্য আচরণবিধি বর্ণিত রয়েছে। বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়ম বা আচরণবিধি লঙ্ঘনেরও অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরদিকে একজন বিচারকের ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করার বিধান থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের ওপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ বা অন্যান্য চাপ কাজ করায় কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় না।

এছাড়া বিচারিক কার্যক্রম তদারকির অংশ হিসেবে অধস্তন আদালতের বিচারকদেরকে প্রতিমাসে মামলা নিষ্পত্তি, মামলা জট ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়। মামলা নিষ্পত্তির প্রতিবেদনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে মামলার ধরনের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিচারকের মামলা নিষ্পত্তির হার মূল্যায়ন করা হয়। মামলা নিষ্পত্তির হারের এ প্রতিবেদন স্থানীয়ভাবে জেলা জজ মূল্যায়ন করে থাকেন। প্রতিমাসে সকল বিচারকদের নিয়ে লক্ষ্য পূরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয় এবং কারও কাজের ঘাটতি থাকলে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় এমন মামলা নিষ্পত্তি করে লক্ষ্য পূরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় বড় বা জটিল মামলা নিষ্পত্তিতে বিচারক আগ্রহী হন না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

সহায়ক কর্মকর্তা-কমচারীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি: স্থানীয়ভাবে অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তদারকি করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক এবং জেলা জজ বা সংশ্লিষ্ট আদালত প্রধানের উপর ন্যাস্ত। তথ্যদাতাদের মতে, সহায়ক কর্মকর্তা-কমচারীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কাজের জন্য সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ গ্রহণের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অল্প কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তি এবং প্রমাণের প্রেক্ষিতে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যেমন- এক সেকশন থেকে অন্য সেকশনে বদলি) গ্রহণ করা হলেও তা অত্যন্ত অপ্রতুল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আদালাতের নানা কাজের জন্য বিচারকদের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীদের নিকট থেকে অসহযোগিতার আশঙ্কায় বিচারকরা কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। অপরদিকে তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, আদালতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ফরমসের অপ্রতুলতার কারণে কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীরা নিজেদের টাকায় তা কিনে আনেন এবং পরবর্তীতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে এ খরচ সংগ্রহ করেন। তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আপ্যায়ন খরচ কোর্ট কর্মচারীরা বহন করেন যা কর্মচারীদের অবৈধ সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে। আবার অনেক সময় কাজের সূত্র ধরে বিচারক ও কর্মচারীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয় বা অনেক কর্মচারীর সাথে উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠানে ভালো যোগাযোগ থাকে। এ সকল বিষয় কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীদের তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কর্মচারীদের এ ধরনের দুর্নীতি অনিয়মের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ না আসায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণ দাখিলের বিধান না থাকায় তাদের অবৈধ উপার্জন সম্পর্কে অবগত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না বলে উত্তরদাতাদের অভিমত। এছাড়া অধস্তন আদালতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকল খানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শনের ঘাটতিও রয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি/পিপি শাখা পিপি/জিপি নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, অভিযোগ তদন্ত, ভাতা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিটি জেলার সরকারি কৌঁসুলী (জিপি)/পাবলিক প্রসিকিউটরের কাজের মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা জজ এর নিকট থেকে একটি মাসিক প্রতিবেদন সলিসিটর উইং-এ পাঠানো হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের কাজের তদারকি করা হয়। এজিপি বা এপিপিরা তাদের জিপি/পিপি'র নিকট তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। তথ্যদাতারা

---

[৬৭]বিচারিক নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে যে, বিচারককে ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করতে হবে; বিচারককে আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও আদালত সহায়ক কর্মচারীদের প্রতি ধৈর্য্যশীল হতে হবে এবং সম্মানসূচক আচরণ প্রদর্শন করতে হবে; একজন বিচারককে তার বিচারিক কার্যাবলী বিশেষত তার নিকট থাকা মামলার রায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে দিতে হবে; বিচারক তার উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পক্ষপাতহীনভাবে, ন্যায়নিষ্ঠভাবে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে; একজন বিচারক তার পরিবার পরিজন ছাড়া কারো নিকট হতে কোনো উপহার সামগ্রী গ্রহণ করবেন না এবং তার কর্মচারীদের উক্ত কাজ হতে বিরত রাখবেন ইত্যাদি। http://www.judiciary.org.bd/ (27/7/17)

জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থীদের প্রতি নানা হয়রানি ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, রাজনীতিকীকরণের ফলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের তদারকি করা বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কিছু ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে।

আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি: ন্যায়বিচার নিশ্চিতে বিচারকদের পাশাপশি আইনজীবীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইন পেশা একটি স্বাধীন পেশা হিসেবে বিবেচিত। আইনজীবিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সুপ্রীমকোর্ট বা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কোনো ভূমিকা থাকে না। তবে আইনজীবীদের সার্বিক জবাবদিহিতা ও তদারকির জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল রয়েছে। এছাড়া আইনজীবীদের জন্য ক্যাননস অব প্রফেশনাল কন্ডাক্ট অ্যান্ড এটিকেট নামক পেশাগত আচরণবিধি[৬৮] রয়েছে। কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে এই পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আসলে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালে তা শুনানী ও বিচারের জন্য আসে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বার কাউন্সিল এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত আইনজীবীর সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সনদ বাতিল করতে পারে।

অপরদিকে, স্থানীয়ভাবে প্রতিটি জেলা আদালতে আইনজীবীদের ভোটে নির্বচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জেলা আইনজীবী সমিতি রয়েছে যারা আইনজীবীদের সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলাসহ অন্যান্য বিষয়াদি দেখাশোনা করে। কোনো সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে আইনজীবী সমিতির আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি বরারবর আবেদন করতে পারে। আইনশৃঙ্খলা কমিটি অভিযুক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে এবং জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কমিটি পারস্পরিক মীমাংসার ব্যবস্থা ও মৌখিকভাবে সাবধান করে দিয়ে থাকে। তবে জেলা আইনজীবী সমিতির ক্ষমতা সীমিত। তারা শুধু কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে সদস্যপদ বাতিল ও বার কাউন্সিলের নিকট লাইসেন্স বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

তথ্যদাতাদের মতে, আইনজীবীদের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকির জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে পরিদর্শন বা পরিবীক্ষণের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়ভাবে আইনজীবী সমিতি থাকলেও তারা আইনজীবীদের স্বার্থ নিশ্চিতেই বেশি তৎপর থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যরা নিজেরাই পদের পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। এছাড়া উভয় কর্তৃপক্ষই শুধুমাত্র লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। তবে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে কোনো ধরনের লিখিত অভিযোগ করেন না। অন্যদিকে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অভিযোগ জানালেও অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিলের সদস্যরা আইনজীবীদের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিবৃাচনের এই রাজনীতি স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে কাজ করে। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করতে পারেন এই আশঙ্কায় অনেক সময় বিচারকরাও আইনজীবীদের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অসাদচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না।

আইনজীবীর সহকারীর কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি: আইনজীবীদের সহকারীদের অ্যাডভোকেট ক্লার্ক নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী বার এসোসিয়েশনের অধীনে তালিকাভূক্ত হয়ে কাজ করতে হয়। সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ে আইনজীবীদের সহকারীদের জবাবদিহিতা মূলত তার আইনজীবীর নিকট। তবে আইনজীবীর সহকারীর অসদাচরণের বিরুদ্ধে বার কাউন্সিলেও বিধি অনুযায়ী অভিযোগ জানানো যায়। তবে স্থানীয়ভাবে আইনজীবীর সহকারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নজরে আনা হয়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনজীবী সমিতি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই আইনজীবীর সহকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি: যথাযথ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে অভিযোগ প্রদানের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আদালতগুলোতে অভিযোগ প্রদানের জন্য কোনো প্রকার অভিযোগ বাক্স বা কোনো অভিযোগকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অভিযোগ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য কোনো রেজিস্টার বইও সংরক্ষণ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট আদালতসমূহের প্রধান বিচারকের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ প্রদান করা যায়। তবে এর জন্য নির্ধারিত কোনো ফরম নেই; হাতে লিখে এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করতে হয়। তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা কোনো ধরনের অভিযোগ জানান না। অভিযোগ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত না থাকা এবং নানা শঙ্কার কারণে তারা অভিযোগ প্রদান হতে বিরত থাকেন বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন। এছাড়া স্বপ্রণোদিতভাবে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

[৬৮] একজন আইনজীবী অপর একজন আইনজীবী, আদালত, বিচারপ্রার্থী এবং জনসাধারণের প্রতি কীরূপ আচরণ করবেন তা এ আচরণবিধিতে বর্ণিত আছে।

অপরদিকে এ গবেষণায় জবাবদিহিতার কিছু ইতিবাচক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা গেছে। দেখা গেছে যে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ তদন্তনাধীন রয়েছে। এক পরিসংখানে দেখা যায় যে, বিগত ছয় বছরের মধ্যে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে ছয় জন জ্যেষ্ঠ জেলা জজসহ ১৬ জন বিচারককে চাকরিচ্যুত এবং আরও প্রায় ৪৬ জন বিচারকের বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তনাধীন রয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত হওয়ার পর সম্ভাব্য চাকরিচ্যুতি এড়াতে আরও ছয় জন স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন। ওই ছয় জনকে নিয়ে দুর্নীতির কারণে মোট ২২ জন বিচারকের চাকরিচ্যুতি ঘটেছে। এ গবেষণায় দেখা গেছে যে, দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-এর টানাপোড়েনে কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অসদাচরণের মতো অভিযোগ নিষ্পত্তি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত হওয়া থেকে চূড়ান্তভাবে অপসারিত হতে কখনো কখনো পার হয়ে যাচ্ছে পাঁচ-ছয় বছর। আবার সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিষ্পত্তি হতেও সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।[৬৯]

অন্যদিকে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তা আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে জানানো যায়। লিখিত এবং স্বাক্ষর সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণ এবং অভিযোগ দায়েরের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, এই অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া অভিযোগকারীর জন্য খুব সহজ না। মূলত এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করার পর তা বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির সামনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এক্সিকিউটিভ কমিটি উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনজীবীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করে। আইনজীবীর জবাবের ভিত্তিতে বা অভিযোগের গুরুত্বের ভিত্তিতে কমিটি অভিযোগ গ্রহণ করে অথবা বাতিল করে। অভিযোগ গৃহীত হলে তা বার কউন্সিলের ট্রাইবুন্যালে প্রেরণ করা হয়। ট্রাইবুন্যাল বিচারিক কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আইনজীবীকে মৌখিক ভৎসনা, সাময়িকভাবে সনদ স্থগিত বা স্থায়ীভাবে সনদ বাতিল করতে পারে। তবে এই অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অভিযোগের সংখ্যার তুলনায় শাস্তি আমলে নেওয়া ও শাস্তি প্রদানের হার অনেক কম। বার কাউন্সিল প্রদত্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ২০১৪ -২০১৭ সালে জুন মাস পর্যন্ত মোট ৫টি ট্রাইব্যুনালে আইনজীবীদের অসদাচরণ সম্পর্কিত মোট মামলার সংখ্যা ১৭৩। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৩৮টি এবং বিচারাধীন রয়েছে ৩৫টি। ১৩৮টি নিষ্পত্তিকৃত মামলার মধ্যে শাস্তি হয়েছে মাত্র ৩ জন আইনজীবীর।

সারণি-৫.২.১: ২০১৪-২০১৭ জুন পর্যন্ত বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের মামলার পরিসংখ্যান[৭০]

মামলা হয়েছে	নিষ্পত্তি	বিচারাধীন	শাস্তি
১৭৩	১৩৮	৩৫	৩

অন্যদিকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগের পিপি/জিপি শাখায় পিপি/জিপি'র বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ প্রদান করা যায় এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে অব্যহতিসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ব্যবস্থা গ্রহণের হার অনেক কম। বর্তমানে অধস্তন আদালতে নিযুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগের তদন্ত চলমান আছে।

[৬৯] আদালতে দুর্নীতির চালচিত্র, *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ নভেম্বর ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/opinion/article/1014401

[৭০] বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

ষষ্ঠ অধ্যায়
অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার

৬.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানির অভিযোগ

প্রতারণা: এই গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, একটি মামলা পরিচালনার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারপ্রার্থীরা নানা ধরনের ব্যক্তিদের (দালাল, আইনজীবী, মুহুরী, আদালতের কর্মচারী প্রভৃতি) দ্বারা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আদালত প্রাঙ্গণে এক শ্রেণীর দালালের আনাগোনা রয়েছে এবং আইনজীবীদের নিকট যাওয়ার পূর্বেই বিচারপ্রার্থীরা দালালদের খপ্পরে পড়েন এবং প্রতারিত হন। যেমন- দালাল তাদের আশ্বাস দেন যে মামলা পরিচালনার জন্য ভালো বা নির্ভরযোগ্য উকিলের সন্ধান দেবেন বা বিচারককে তাদের পক্ষে রায় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। সেজন্য তারা টাকা পয়সাও নিয়ে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, দালালরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। দালালের খপ্পরে পড়ে বিচারপ্রার্থীদের সময়ক্ষেপণ হয় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আদালত প্রাঙ্গণে কিছু সনদবিহীন অ্যাডভোকেট দেখা যায় যারা প্রকৃতপক্ষে আইনজীবী নন (লাইসেন্স নেই) কিন্তু কালো কোট পড়ে ঘুরে বেড়ান। এর ফলে বিচারপ্রার্থীরা তাদের দেখে বিভ্রান্ত হন এবং তাদের[৭১] দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়।

> "প্রথম আইনজীবী পরিবর্তন করেছি কারণ সে দক্ষ ছিল না। সে অন্য আইনজীবীদের সহযোগিতা নেয় সেজন্য প্রথম আইনজীবী পরিবর্তন করেছি। দ্বিতীয় আইনজীবী পরিবর্তন করেছি কারণ সে আইনজীবী ও তার মুহুরী তত বেশি ভালো না। তারিখ না পড়লেও তারিখের কথা বলে কোর্টে এনে টাকা নেয়। আমার বর্তমান আইনজীবী অনেক ভালো। সে অনেক অভিজ্ঞ।"- একজন তথ্যদাতা

এ গবেষণায় আইনজীবীদের (রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীসহ) দ্বারা বিচারপ্রার্থীদের প্রতারিত হওয়ার নানা তথ্য ও অভিযোগ উঠে এসেছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীরা নিজেরা মামলা পরিচালনা করেন না বরং মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। তারা বিচারপ্রার্থীদের ভুল বুঝিয়ে (নিজেই মামলা পরিচালনা করবেন বলে জানান) মামলা হাতে নিয়ে পরে তা অন্য উকিলকে দিয়ে দেন এবং কমিশন বা অর্থের ভাগ নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- বিচারপ্রার্থীর নিকট থেকে মামলা পরিচালনা বাবদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে অপর আইনজীবীকে হয়ত মামলা পরিচালনার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিলেন এবং বাকি ২০ হাজার টাকা নিজে রেখে দিলেন। এসব ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত সব তথ্য জানতে পারেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে আদালতে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফি বা খরচের বাইরেও সংশ্লিষ্ট অনেককে অর্থ প্রদান করতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অর্থ আইনজীবী বা তাদের মুহুরীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সে অর্থ আইনজীবী বা মুহুরীরা বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকেই নিয়ে নেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আইনজীবীদের অনেকে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রকৃতভাবে যে অর্থ খরচ হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে দাবি করেন। যেমন- হয়তো যে কাজ ৪০০ টাকায় হয়ে যাবে সে কাজের জন্য ১০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। একইভাবে আদালতের কর্মচারী ও আইনজীবীর সহকারীরাও বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রকৃত অর্থের থেকে অনেক বেশি অর্থ নিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

> "আমি যদি আমার মক্কেল দ্বারা পেইড হই, তাহলে তো দায়িত্বটা অবশ্যই আমাকে পালন করতে হবে। অনেক মক্কেল আইনজীবীদের দ্বারা প্রতারিত হয়, তবে এটা সব আইনজীবীদের দ্বারা নয়। শতকরা ২-৪ জন এ রকম থাকতে পারে তবে তাদের সংখ্যা কম। বাকিরা কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মক্কেলদের ভালো করার জন্যে। " - একজন তথ্যদাতা

এছাড়া টাকা নিয়েও কাজ করেন না এমন অভিযোগও আইনজীবী, আদালতের কর্মচারী ও আইনজীবী সহকারীদের বিরুদ্ধে রয়েছে। যেমন- কোনো মামলায় বাদীপক্ষ আপিল করার জন্য আইনজীবীকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে কিন্তু আইনজীবী আপীল করেননি এবং বাদীপক্ষ তা জানেই না। বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের নির্ধারিত সময়সীমা (যেমন- দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে তামাদি আইন বা সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে) থাকে। এসকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা বা আপলির আবেদন

[৭১] ঢাকা বারের টাউট উচ্ছেদ অভিযানে ভুয়া আইনজীবী আটক, *লয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ*, ১৮ এপ্রিল ২০১৭

ফাইল না করা হলে তা পরবর্তীতে পক্ষগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক সময় আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদের নিকট থেকে বেশি টাকা নেয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির (যেমন- বিচারক, পিপি/জিপি বা আদালতের কর্মচারী ইত্যাদি) নাম ভাঙ্গিয়ে (বলেন যে, পিপিকে দিতে হবে, জজকে দিতে হবে ইত্যাদি) টাকা নেন, যদিও সে অর্থ হয়ত উক্ত ব্যক্তির (যার নাম বলে টাকা নেওয়া হয়) হাতে পৌঁছে না। এ ধরনের আইনজীবীরা তাদের মক্কেলের কাছ থেকে টাকা নেন বলেন যে, "জজ স্যারকে দেয়া লাগবে।" তারপর টাকাটা নিয়ে বিচারকের রুমে যান এবং তার সাথে হয়ত অন্য কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর মক্কেলকে দেখান যে, তিনি বিচারককে টাকা দিলেন। একইভাবে আদালতের কর্মচারী, আইনজীবীর সহকারি বা পিপি/জিপিরাও অন্যের নামে বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কিছু আইনজীবী ও আইনজীবীর সহকারীরা অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার জন্য বিচারপ্রার্থীদের মামলার শুনানীর তারিখ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেন বা ফলস ডেট দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যায় যে, বিচারপ্রার্থী হয়তো উক্ত ভুয়া তারিখে (ফলস ডেটে) আদালত প্রাঙ্গণে চলে আসেন তখন আইনজীবী তার নির্ধারিত ফি নিয়ে বিচারপ্রার্থীকে আবারও ভুল বুঝিয়ে (যেমন- বিচারক নেই তাই কোর্ট বসবে না) বিদায় করে দেন। ফলে বিচারপ্রার্থী আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্তমানে অনেক আদালতে বিচারক এজলাসে বসেই মামলার পরবর্তী তারিখ বলে দেন এবং আদালতের কজ লিস্টও আদালতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারপ্রার্থীরা তাদের অসচেতনতা বা অজ্ঞনতাবশত সহজেই তথ্য জানতে পারেন না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনজীবীদের ওপর নির্ভর করেন।

এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীরা বিচারক তার পরিচিত বা বিচারকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এবং রায় ম্যানেজ করে দেওয়া যাবে বা পক্ষে করে দেওয়া যাবে এসব বলে বিচারপ্রার্থীদের প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে প্রতারিত[৭২] করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কিছু ক্ষেত্রে মামলার দুই পক্ষের আইনজীবীরা টাকার বিনিময়ে সমাঝোতা বা যোগসাজশ করে ফেলেন বা একপক্ষের আইনজীবী অন্যপক্ষের সাথে আঁতাত করেন যা বিচারপ্রার্থী জানতে পারেন না। ফলে আইনজীবী পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন এবং মামলা পরিচালনায় যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন না। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও এমন অভিযোগ রয়েছে।

> "সে আমার থেকে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে জামিন করাবে বলে কিন্তু আমার বিবাদীর পক্ষ থেকে টাকা খেয়ে আমার পক্ষে কথা বলে নাই সে কারণে আমাকে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ কারণে আইনজীবী পরিবর্তন করেছি। দ্বিতীয় আইনজীবী নিয়োগের সময় তার সাথে চুক্তি হয় যে আমাদের জামিন করিয়ে দিবে। সে আমাদের জামিন করিয়ে দিয়েছে।"- একজন তথ্যদাতা

আবার অনেক তথ্যদাতা জানিয়েছেন যে, মামলা করার পূর্বে উকিল অনেক ভালো ভালো কথা বলে মামলা করান। কিন্তু পরবর্তীতে উকিলের আচরণ পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া তথ্যদাতারা বলেছেন যে, অনেক সময় আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরীরা আইনজীবী সেজে প্রতারণা করেন, উকিলদের অবর্তমানে জামিন করে দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়ে থাকেন।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা: মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন এমন অভিযোগ করেছেন তথ্যদাতারা। তথ্যদাতাদের মতে, বিচারক, আদালতের কর্মচারী, আইনজীবী ও আইনজীবীদের সহকারীরা কিছু ক্ষেত্রে যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন। তথ্যদাতারা আরও বলেছেন যে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মঘন্টার অধিকাংশ সময়ই এজলাসে থাকার কথা কিন্তু অনেক বিচারক সেই পরিমাণ সময় এজলাসে দেন না। তথ্যদাতারা এর কিছু কারণও (যেমন- এজলাস কক্ষ ঘাটতি, জবানবন্দি গ্রহণ, রায় লেখা, প্রশাসনিক কার্য ইত্যাদি) উল্লেখ করেছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, অনেক এলাকার আদালতের কার্যক্রম অনেক দেরীতে শুরু হয়। ফলে সেখানে বিচারের জন্য কর্মঘন্টা কমে যায়। আবার কিছু এলাকায় দেখা গেছে যে, বিচারকদের একাংশ ঐ এলাকায় বাস না করে অন্য নিকটবর্তী জেলায় বাস করেন এবং প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে অফিস করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাপ্তাহিক ছুটি শুরুর আগের দিন কর্মস্থল ত্যাগ করার কারণে দিনের দ্বিতীয়ভাগে অনেক সময় বিচারকদের পূর্ণ অফিসকালীন সময়ে পাওয়া যায় না। এভাবে এজলাস কক্ষে বিচারকার্যের সময় স্বল্পতার কারণে মামলা দীর্ঘসূত্রতার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গবেষণার আওতাভুক্ত একটি এলাকা বিভাগীয় শহর থেকে নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সেখানকার বিচারকদের একাংশ কর্মস্থলে থাকেন না এবং সাপ্তাহিক ছুটি শুরুর আগের দিন বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কর্মস্থল ত্যাগ করেন।

অন্যদিকে, গবেষণায় আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়টিও উঠে এসেছে। তথ্যদাতারা বলেছেন যে, মামলা সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের সাথে জড়িত কর্মচারীদের একাংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে

[৭২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৭ মার্চ ২০১৭, বিচারকের মামা পরিচয় দেওয়া আইনজীবী রিমান্ডে

পালন করেন না। যেমন- সমন জারি হওয়া মামলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর দায়িত্বে থাকে সমন জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার। কিন্তু এই জারিকারকরা অধিকাংশক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সমনগুলো জারি করেন না বরং এর জন্য তারা অর্থ দাবি করেন।

এ গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, আইনজীবীরাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, ব্যবসায়িক (মামলা শেষ হয়ে গেলে উক্ত মামলা থেকে তার আয় বন্ধ হয়ে যাবে) মানসিকতা থেকে কিছু আইনজীবী মামলা শেষ করতে আগ্রহী হন না, মামলার প্রতি গুরুত্ব দেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করেন। যেমন- আদালতের নিকট বার বার সময় প্রার্থনা, যে কাজ স্বল্প সময়ে করা সম্ভব সে কাজের জন্য দীর্ঘ সময় নেওয়া ইত্যাদি। একজন বিচারপ্রার্থী বলেছেন, "... জামিনের পর দুই বছর তার (উকিলের) দ্বারা মামলা পরিচালনা করেছি। প্রতি হাজিরার তারিখে ২-৩ হাজার টাকা নিতো কিন্তু মামলা শেষ করার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নাই, গুরুত্ব দেয় কম তাই আইনজীবী পরিবর্তন করেছি। "

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদেরকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেন না। আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদেরকে মামলা জেতার সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কেও ভালোভাবে অবগত করে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে বিচারপ্রার্থীরা তাদের মামলা সম্পর্কে অন্ধকারে থাকেন এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। আবার এমন দেখা গেছে যে, আইনজীবীরা হয়তো পূর্বেই জানেন যে নির্ধারিত শুনানীর দিন আদালত বসবে না (বিচারক প্রশিক্ষণে বা ছুটিতে থাকলে), কিন্তু তিনি তার মক্কেলকে তা অবগত করেন না। ফলে উক্ত বিচারপ্রার্থী আদালতে আসেন এবং কাজ না হওয়ায় আবার ফিরে যান কিন্তু আইনজীবীকে ঠিকই তার পারিশ্রমিক দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করায় মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আইনজীবী পরিবর্তন করতে হয়।

"আইনজীবীকে নিযুক্ত করতে সমস্যা হয়েছে। আইনজীবী পরিচিত ছিলো না। বাসার পাশের পরিচিত এক জনের কথায় একজন আইনজীবী ধরেছিলাম। ঐ পরিচিত ব্যক্তি যে দালাল সেটা জানতাম না। যে আইনজীবীর সাথে পরিচয় করায়ে দিছিলো ঐ উকিলের সাথে জামিনের জন্যে দুই লাখ টাকার চুক্তি হয়েছে। ঐ দুই লাখ টাকায় সে ছোট দুইটা মামলার জামিন করায়ে দিছে। কিন্তু আরেকটা অস্ত্রের মামলা ছিলো ঐটার জামিনের জন্যে সাড়ে তিন লাখ টাকা চুক্তি হয়েছিলো। উকিল টাকাও নিছে কিন্তু জামিন করায়ে দেয় নি। পরে ঐ আইনজীবী পরিবর্তন করছি। নতুন আইনজীবী ধরেছি।"

- একজন তথ্যদাতা

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের সম্পর্কেও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ উঠে এসেছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে মামলার শুনানীর সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা (বিশেষ করে এপিপি বা এজিপি) আদালতে উপস্থিত থাকেন না। ফলে অনেক সময় মামলা খারিজ হয়ে যায় বা একতরফা ডিক্রী হয়ে যায়। এছাড়া আরও অভিযোগ রয়েছে যে, তারা টাকা ছাড়া সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন না করে ফেরত দিয়ে দেন। অভিযোগ আছে যে, তারা নিজের আইন ব্যবসায় ব্যস্ত থাকেন। এছাড়া বিরোধী পক্ষের সাথে অর্থের বিনিময়ে হাত মিলিয়ে মামলাগুলো যথাযথভাবে লড়েন না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। সরকার ও বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন, "রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা প্রায় সবাই ম্যানেজড হয়ে যায়। সাক্ষী আসার পর এমন প্রশ্ন করে যে সে আসামীকে বাঁচাতে চায়। যে পয়েন্টে সাক্ষ্য নেওয়ার কথা সেটা নেয় না।"

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন: আদালতে একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করানোর জন্য বা কাজ দ্রুত করানোর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন- আদালতের কর্মচারী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরী, পুলিশ ইত্যাদি) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয় বা মামলা পরিচালনার প্রকৃত বা প্রাক্কলিত মূল্য ব্যতীত অতিরিক্ত অনেক অর্থ প্রদান করতে হয় বলে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার সংস্কৃতি প্রচলিত থাকায় এটি একটি আবশ্যিক নিয়ম বা প্রথায় পরিণত হয়েছে। আদালত ব্যবস্থায় অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না বা হলেও তা সময়মত সম্পন্ন হয় না বলে অভিযোগ লক্ষ করা গেছে।

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন কাজে যেমন- মামলা দায়েরের জন্য, হাজিরা দেওয়া, কোনো নথি দেখা, শুনানীর জন্য তারিখ (লং ডেট বা শর্ট ডেট অর্থাৎ শুনানীর তারিখ পিছিয়ে নেওয়া বা এগিয়ে আনার জন্য) নেওয়া, জবানবন্দি গ্রহণের পর স্বাক্ষর দেওয়া, মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কোনো পিটিশন দেওয়া, ইনজানকশনের এফিডেফিট করা, কোনো ডকুমেন্টের সত্যায়িত কপি উত্তোলন, সমন বা নোটিশ জারি করার জন্য, এজাহারের কপি উত্তোলন, বেলবন্ড জমা, রায়ের জাবেদা কপি উত্তোলন ইত্যাদির জন্য আদালতের বিভিন্ন কর্মচারীদের অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে কাজ না হওয়া বা দেরিতে

হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে দেখা গেছে যায় যে, এই ধরনের অর্থ নেওয়ার পরিমাণ কোথাও নির্দিষ্ট নয় বরং তা মামলার ধরণ, গুরুত্ব, বিবাদী বা আসামীর সংখ্যা, কাজের জরুরী ভিত্তি, বিচারপ্রার্থীর সামর্থ্য ও এলাকার ওপর নির্ভর করে। তবে দেখা গেছে যে, কিছু কাজের জন্য অর্থের পরিমাণের পরিসীমা নির্ধারিত রয়েছে এবং এলাকাভেদে অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ঐ এলাকাগুলোতে অর্থের লেনদেনের পরিমাণ অন্য এলাকার তুলনায় বেশি। বিভিন্ন এলাকার তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আদালতে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের যে পরিমাণ জানা যায় তার পরিসীমা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো। বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এই অর্থ লেনদেন মূখ্য তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সন্নিবেশিত। তবে এই আর্থিক লেনদেন ব্যতীত যে কাজ হতে পারে না তা বোঝায় না। তবে এই তথ্য বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ লেনদেন সচারচর ঘটে থাকে তার একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

> "পিটিশন দাখিল করার সময় টাকা চায় স্টাফরা। টাকা না দিলে পেশকার তখন নথিটা সরিয়ে ফেলে, পরে দেখা করতে বলে। এভাবে ঘুরায়। টাকা নিয়েই ছাড়ে পেশকার। ওদের দাবি থাকে প্রতি ধাপে ধাপে ওরা টাকা চায়। পেশকার, জারিকারক এরা টাকা নিতে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।" - একজন তথ্যদাতা

সারণি-১৩: দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (পরিসীমায়)

কাজের ধরন	টাকার পরিমাণ (পরিসীমায়)
আরজি দাখিল বা মামলার ফাইলিং সংক্রান্ত কাজ	২০-২০০০
শুনানীর দিন হাজিরা	২০-৫০০
শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ (সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া)	১০০-১০০০
আরজি সংশোধন	১০০-৩০০
সমন জারি	২০০-১০,০০০
সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ (সীল, স্বাক্ষর ইত্যাদি)	৫০-১০০০
সাক্ষীর জেরা/জবানবন্দির কপি তোলা	১৫০-১০০০
নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ প্রক্রিয়াকরণ	১০০-২০০০
নথি দেখার জন্য	৫০-১০০০
শুনানীর জন্য আদালতে নথি উপস্থাপন	৫০-৫০০
রায়ের নকল বা জাবেদা নকল (ফলিওর ওপর নির্ভর করে, ফলিও প্রতি ৫০/৬০ টাকা)	২০০-৫০০০

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক সময় আদালতে সকলের সম্মুখে বিচারক শুনানীর পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করে দেন বা আদালত কক্ষের সামনে শুনানীর তারিখসহ মামলার তালিকা টাঙ্গানো থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে এ কাজে কাউকে টাকা দিতে হয় না।

দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিবাদীর ওপর সমন জারি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সমন যথাযথভাবে জারি না হলে তা মামলাকে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে ফেলে দিতে পারে বা মামলার পক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কাজে তুলনামূলকভাবে বড় অংকের অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়ম অনুযায়ী আদালত সমন জারির আদেশ দিলে সমনের কপি নিয়ে জারিকারক বা প্রসেস সার্ভার বিবাদী পক্ষের নিকট যাবেন এবং তাকে সমনের কাগজ দিয়ে মামলা সম্পর্কে অবগত করে সমন যথাযথভাবে জারি হয়েছে এ মর্মে নথিভুক্ত করবেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, সমন যথাযথভাবে জারির জন্য অধিকাংশক্ষেত্রে ২০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জারিকারক বাদী এবং বিবাদী উভয়ের বাড়িতেই যান এবং টাকা দাবী করেন। বাদীকে বলে টাকা না দিলে তিনি সমন জারি করবেন না। আবার বিবাদীকে বলেন যে, তার নামে সমন এসেছে, টাকা না দিলে তিনি দেবেন না বা টাকা দিলে জারি দেখাবেন না। এ ক্ষেত্রে টাকা না দিলে সমন জারি হয় না বা জারি হতে দীর্ঘ সময় চলে যায় এবং মামলা দীর্ঘায়িত বা প্রলম্বিত হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কোনো নোটিশ জারি করার জন্য যাতায়াত ভাতা বাবদ সরকারি যে বরাদ্দ থাকে তা বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (জারিকারকের সরকারি ফি প্রতি কিলোমিটার দুই টাকা)। এছাড়া জারিকারকদের ওপর অনেক সমন জারি করার দায়িত্ব থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন জারির জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে হয়। এ সকল কারণেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ গ্রহণে উৎসাহিত হয়ে থাকে বলে উত্তরদাতাদের অভিমত।

এছাড়া নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রক্রিয়াকরণ ও নোটিশ জারিতে টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে শুনানীর দিন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করার পর নথিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর ও অফিশিয়াল সীল দেওয়ার সময়ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে টাকা (৫০-১০০০ টাকা) দিতে হয়। এছাড়া পরবর্তী সময়ে যদি মামলার প্রয়োজনে সাক্ষীর জেরা/জবানবন্দীর নথি দেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কপি তোলার জন্য ১৫০-১০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। একইভাবে মামলার কোনো নথি দেখার জন্য এবং আদালতে নথি উপস্থাপনের জন্যও টাকা দিতে হয়।

"কোর্ট কর্মচারীরা টাকা নেয় এটা ওপেন সিক্রেট। মামলা ফাইল করতে সেরেস্তা ১০০-১৫০ টাকা, হাজিরা দেয়ার সময় ২০ টাকা পেশকারকে, ১০ টাকা পিয়নকে দিতে হয়। নকলের জন্যে সরকারি ফি ৩০ টাকা, এটা অনেক সময় তাড়াতাড়ি লাগলে ৩০০-৫০০ টাকা লাগে। এটা উকিল সাহেব নেয় ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে।" - একজন তথ্যদাতা

রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি অর্থ লেনদেন হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নকলখানায় রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের আবেদন অনেক বেশি থাকে এবং সবাই জরুরী ভিত্তিতে এ কপি চায়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অফিসেই এই কপি টাইপ করে বা প্রস্তুত করে সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা বাইরে থেকে ফলিও (নির্ধারিত কাগজ) কিনে এবং অনেক সময় বাইরে থেকে টাইপ করে এনে সরবরাহ করা হয়। রায়ের নকল বা জাবেদা কপি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত সরকারি ফি'র বাইরে ২০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, এই টাকার পরিমাণ রায়ের আকার (কত পৃষ্ঠার রায়), ফলিও সংখ্যা (ফলিও প্রতি রেট নির্ধারিত থাকে) ও জরুরি প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে।

অন্যদিকে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রেও প্রায় একইভাবে অর্থের লেনদেন হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আদালতের অন্যান্য কর্মচারীদের পাশাপাশি ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে পুলিশরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে মামলার বিভিন্ন কাজের যেমন- ওয়ারেন্ট কপি থানায় পাঠানো, ওকালতনামা সনাক্ত, জামিননামা সংক্রান্ত, বিভিন্ন নথি উত্তোলন, আসামিকে খাবার বা কোনো সুবিধা দেওয়ার জন্য ইত্যাদির জন্য পুলিশদের অর্থ প্রদান করতে হয় এবং এক্ষেত্রে ২০০-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

সারণি-১৪: ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (পরিসীমায়)

কাজের ধরন	টাকার পরিমাণ (পরিসীমায়)
মামলার ফাইলিং (সিআর মামলার ক্ষেত্রে)	২০-৩০০
মামলা আমলে নেওয়ার পর নোটিশ জারী	৫০-২০০০
বিবাদীর পিটিশন দাখিল	৫০-৩০০
প্রতি শুনানীর দিন হাজিরা সংক্রান্ত কাজ	২০-২০০
শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ (সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া)	৫০-৫০০
ওয়ারেন্ট দ্রুত পাঠানোর জন্য	১০০-৭০০
সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহন সংক্রান্ত কাজ (সীল, স্বাক্ষর ইত্যাদি)	১০০-৫০০
যেকোনো নথির কপি তোলা (এফআইআর ও অন্যান্য)	৫০-১০০০
জামিনের দরখাস্ত	১০০-১০০০
জামিননামা জমা	১০০-১৫০০
জামিননামা ও জামিনের আদেশ কারাগারে প্ররণ	১০০-৫০০০
জামিন না পেলে পুনরায় আবেদন	১০০-১০০০
জাবেদা নকল (ফলিওর ওপর নির্ভর করে)	৫০০-৫০০০

ফৌজদারী মামলায় আসামির জামিনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেখা গেছে যে জামিন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে টাকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। জামিনের দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য ১০০-১০০০ টাকা পর্যন্ত, জামিনের আদেশ হলে জামিননামা জমা দেওয়ার জন্য ১০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত এবং জামিননামা কারাগারে প্ররণের জন্য ১০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দিতে হয়। যেক্ষেত্রে আসামীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে টাকার পরিমাণও বেশি হয়। যদি প্রথমবার জামিন না হয় তখন পুনরায় জামিনের আবেদন করার জন্যও টাকা দিতে হয়। এছাড়া রায়ের নকল উত্তোলনের জন্য ৫০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকারের মামলায় যেখানে রাষ্ট্র মামলার একটি পক্ষ হিসেবে থাকে সেসব মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা (জিপি,এজিপি বা পিপি, এপিপ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা তথা বিচাপ্রার্থীর স্বার্থ রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরাও বিচারপ্রার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে অর্থ আদায় করে থাকেন। কোনো ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয়ের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- সাক্ষীর শুনানী করার জন্য, কোন নথি সিন করার জন্য, জেরা করার সময় বা যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের সময় যথাযথ ভূমিকা না রাখাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের ঘুষ বা অর্থ দিতে হয়। এমনকি মামলার দু'পক্ষ আপোষ হয়ে মীমাংসা ও মামলা প্রত্যাহারের জন্যও রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীদের অর্থ প্রদান করতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসকল কাজের জন্য ২০০- ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয় বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন। একজন তথ্যদাতা বলেছেন, "রাষ্ট্রপক্ষের পিপি/এপিপির কাছে পয়সা ছাড়া কোনো মক্কেল কোনো সুবিধা পায় না। মামলা অনুযায়ী টাকা নেন। আবার বিবাদীপক্ষের মহুরীদের কাছ থেকে নেয়। পয়সা নিয়ে মামলা বিক্রি করে দেয়।"

বক্স ৬: টাকা দেওয়ার পরও হয়রানি

অনেক ক্ষেত্রে আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে টাকা দেওয়ার পরও হয়রানির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো প্রয়োজনীয় নথি আজ দেওয়া যাবে না, কাল দেওয়া যাবে, কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না, খুঁজে বের করতে সময় লাগবে - এই রকম নানা কথা বলে তারা ঘোরান। অনেক ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি অর্থ প্রত্যাশা করেন। তবে তথ্যদাতারা এও জানিয়েছেন যে, এই অর্থ আদায়ের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল। যেমন অনেক স্টাফ আছেন সৎ - তারা টাকা দিলেও নেন না। আবার অনেক স্টাফ আছেন যারা ১০০ টাকার নিচে কোনো কাজই করবেন না। আবার অনেকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে বিনামূল্যে কাজ করে দেয়। এছাড়া অনেক তথ্যদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, উকিল ও বিচারপ্রার্থীরাই নিজেদের স্বার্থে মামলার বিভিন্ন কাজের জন্য টাকা দিয়ে কর্মচারীদের অভ্যাস খারাপ করে ফেলে। যেমন- কেউ হয়তো জরুরী ভিত্তিতে কোনো কাজ করার জন্য কোনো কর্মচারীকে ১০০ টাকা দিলেন, পরবর্তীতে ওই কর্মচারী ঐভাবে টাকা নেওয়াটাকে নিয়মে পরিণত করেন। অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থ নেওয়াকে খুশি হয়ে দেওয়া বা বকশিশ হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

এভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকারের মামলায় বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়া হয় বলে ব্যাপক অভিযোগ লক্ষ করা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রে এই টাকার পরিমাণ কম মনে হলেও একটি আদালতে প্রতিদিন মামলার সংখ্যা দিয়ে হিসেব করলে এই টাকার পরিমাণ অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আইনজীবী বা তাদের মুহুরীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা সরাসরি কর্মচারীদের সাথে বা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং টাকার বিনিময়ে কার্যসম্পাদনের চুক্তি করেন।

এছাড়া তথ্যদাতারা আরও জানিয়েছেন যে, মামলার কারও পক্ষে কোনো আদেশ বা চূড়ান্ত রায় (জামিন করে দেওয়ার জন্য, আসামী খালাস করে দেবে, ডিক্রি পাওয়ায় দেওয়ার জন্য, নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়ার জন্য ইত্যাদি) প্রভাবিত করার জন্যও বড় অংকের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে এ সকল কাজের জন্য মামলার উভয় পক্ষ (বাদী-বিবাদী) থেকে টাকা নেওয়া হয়। যে পক্ষ মামলা জেতে তার টাকা রেখে দেওয়া হয় এবং যে পক্ষ হেরে যায় তার টাকা সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ (এই বলে যে রায় প্রভাবিত করার জন্য খরচাপাতি হয়েছে) রেখে বাকিটা ফেরত দেওয়া হয়। অভিযোগ আছে যে, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতারণামূলকভাবে এই টাকা নেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে রায় প্রভাবিত করার জন্য কিছুই করা হয় না বরং স্বাভাবিকভাবেই মামলার আদেশ বা রায় দু'পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষে যায়। কিন্তু যারা টাকা নেন তারা বিজয়ী বিচারপ্রার্থীকে বোঝান যে, টাকা দেওয়ার কারণেই তিনি মামলা জিততে পেরেছেন এবং পরাজিত প্রার্থীকে বোঝান যে, তার বিরোধীপক্ষ আরও বেশি টাকা দিয়ে রায় কিনে নিয়েছেন। একইভাবে আইনজীবীরাও তাদের মক্কেলদের কাছ থেকে এ ধরনের কাজের জন্য টাকা নেন।

অপরদিকে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত[৭৩] করা হয়। সেক্ষেত্রে ২০,০০০ -১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া কয়েকটি এলাকায় অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, মামলার আদেশ বা রায় প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের যোগসাজশ কাজ করে। এখানে বিভিন্ন কর্মচারী, আইনজীবী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে যে, কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীদের

[৭৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ সে ২০১৭, বরিশালের বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

মাধ্যমে এ ধরনের লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকের নাম করে টাকা নেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বিচারক তার কিছুই জানেন না।

"অনেক সময় পেশকার জজ সাহেবকে দেখিয়ে টাকা নেয় যা জজ সাহেব জানে না। এখানে ১০ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা লেনদেন হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা গেলো পেশকার জজ সাহেবের খাস কামরার পর্দা সরিয়ে সালাম দিলো অথচ বের হয়ে বললো জজ সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। এরা বাদী-বিবাদীর উভয়ের কাছ থেকে টাকা নেয়। রায় তো যে কোনো একজনের পক্ষেই যাবেই। যার বিপক্ষে যায় তার টাকা ফেরত দিয়ে দেয়।"- একজন তথ্যদাতা

জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও জালিয়াতি: অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদেরকে মামলা সংক্রান্ত কোনো কাজের জন্য জিম্মি করে ফেলা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উদ্দেশ্য তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং নানাভাবে হয়রানি করা। বিচারপ্রার্থীদের নিজস্ব আইনজীবী বা তাদের মুহুরীরাও তাদেরকে জিম্মি করে বা জোরপূর্বক অর্থ আদায় করেন। মামলার মূল খরচের বাইরে, মামলা চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে আইনজীবীরা বার বার টাকার জন্য চাপ দিয়ে থাকেন এমন অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দেখা যায় যে, একজন বাদী বা বিচারপ্রার্থী তার মামলাটি প্রত্যাহার বা আইনজীবী পরিবর্তন করতে চান, এর জন্য আবেদনপত্রে তার বিদ্যমান আইনজীবীর নিকট থেকে একটি স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, তার আইনজীবী উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিতে চান না। বরং মোটা অংকের অর্থ দাবী করেন এবং বিচারপ্রার্থীকে বার বার ঘোরান।

বক্স-৭: মোহরানার টাকা থেকে অর্থ দাবি

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানার দাবি পরিশোধের আদেশের প্রেক্ষিতে স্বামী যখন মোহরানার টাকা পরিশোধ করে দেন (অনেকক্ষেত্রে এই টাকা আইনজীবীর অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় বা বাদীনীর হাতে ক্যাশ দেওয়া হয়) তখন আইনজীবী বাদীনীর উক্ত মোহরানার টাকা থেকে তার অংশ কেটে রাখেন বা ভাগ দাবি করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে মোহরানার টাকা কোর্ট সেরেস্তায় থাকে এবং উত্তোলনের জন্য উকিলের স্বাক্ষর লাগে। তখন উকিল সুযোগটা নেন। ১লাখ টাকা হলে ৫-১০ হাজার টাকা দাবি করেন। একজন এনজিও প্রতিনিধি জানিয়েছেন"...আমাদের একটা মোহরানার মামলা ছিলো। ৬০ হাজার টাকায় মীমাংসা হইছে কিন্তু আমাদের প্যানেল লইয়ারই ওখান থেকে ১০ হাজার টাকা দাবি করছে।"

আবার আইনজীবী বা তাদের মুহুরীরা বা বিচারপ্রার্থীরা যখন মামলা সংক্রান্ত কাজে আদালতের কর্মচারীদের নিকট যান এবং কাজটি যদি জরুরীভিত্তিক হয় তখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের নিকট থেকেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি অর্থ আদায় করেন। যেমন- একটি বেলবন্ড বা জামিননামা এবং জামিনের আদেশ যদি জরুরীভিত্তিতে কারাগারে পাঠানোর প্রয়োজন থাকে, তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য কর্মচারীরা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি অর্থ দাবি করেন এবং তা না দিলে যথাসময়ে কাজ না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরাও বিচারপ্রার্থীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিম্মি করে জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, টাকা ছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা সাক্ষী আদালতে হাজির করতে চান না।

"পিপির বিষয়ে বলতে চাচ্ছি না। খুবই জঘন্য অবস্থা। আমার একটা ক্লায়েন্ট ৭-৮ বছরের ধর্ষিত। ওর পিতার কাছে পিপি টাকা চায় ১০০০-১৫০০ টাকা, না হলে মামলা উঠাবে না, সাক্ষী উঠাবে না। "- একজন তথ্যদাতা

তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে মামলার কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন আদেশ বা রায় পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে। এতে আদালতের কর্মচারী, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[৭৪]

বক্স-৮: জালিয়াতি করে আসামী পরিবর্তন

"মার্ডার কেসে একজন লোকের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হইছে। সে লোক এখন দেশের বাইরে, তার পরিবর্তে ভাড়া করে একজন লোককে জেলে ভরে দিছে এবং এতে আইনজীবীও জড়িত। যে ভাড়াটিয়া হিসেবে ঢুকছে, সে মাসে মাসে টাকা পাবে, এবং আশ্বাস দিছে যে কিছুদিন পরই তার জামিন হয়ে যাবে। কিন্তু সাজাটাতো হয়েছে যাবজ্জীবন। যখন তার জামিন হচ্ছে না তখন সে জেলের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু করলো, জেলারকে বললো এবং সে ঘটনাটা প্রকাশ পেলো।" - একজন তথ্যদাতা

[৭৪] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ মার্চ, ২০১৭, ১০৬ আসামির জামিন জালিয়াতির মামলার রায়: আদালতের দুই কর্মচারীসহ ৫জনের কারাদন্ড

প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য চাপ: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী আদালতের বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার জন্য প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আদালতের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (যেমন- বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী) নানা ধরনের তদবির, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ বা রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বিচারকদের নিকট কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিচারিক কার্যক্রম বা মামলার কার্যক্রম সম্পর্কিত (জামিন দেওয়া, শাস্তি দেওয়া, কারো পক্ষে রায় দেওয়া, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি) তদবির ও চাপ আসে।

ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে তদবির ও চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি আসে বলে এ গবেষণায় উঠে এসেছে। তথ্যদাতারা বলেছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজন এবং সহকর্মীদের নিকট থেকে মামলা সংক্রান্ত তদবির আসে। অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে এবং রাজনৈতিক তদবির ও চাপও আসে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু ক্ষেত্রে জেলা জজ বা আদালত প্রধান, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিকট থেকেও তদবির আসে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, তদবির না শুনলে অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেমন- বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নেতিবাচক দেওয়া, শাস্তিমূলক বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বিভাগীয় তদন্ত, হয়রানি, বাজেট ঠিকমতো না দেওয়া, অবসর ভাতা পেতে কষ্ট হওয়া, বদলির অর্ডার (জিও) না হওয়া ইত্যাদি।

অপরদিকে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, স্থানীয়ভাবে সরাসরি রাজনৈতিক তদবির বা চাপ বিচারকদের নিকট তুলনামূলকভাবে কম আসে। অভিযোগ আছে যে, রাজনৈতিক তদবিরগুলো মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আসে। এলাকাভেদে এই ধরনের চাপ কম বা বেশি পরিমাণে আসে। যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি তদবির বা রাজনৈতিক চাপ আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ওপর রাজনৈতিক তদবির বা চাপ থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক প্রাধান্য বিবেচনায় নিয়োগ হওয়ার কারণে স্থানীয় নেতাদের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা দেখা যায়।

আবার কিছু ক্ষেত্রে আদালত পরিদর্শনের সময় বা ব্যক্তিগত ভ্রমণকালে (নিজ জেলা বা পর্যটন এলাকা) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে ঢাকা থেকে বড় একটি টিম যায়। এ সকল ক্ষেত্রে প্রটোকল ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করার দায়িত্বে স্থানীয় পর্যায়ের বিচারিক কর্মকর্তারা নিয়োজিত থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে তাদের জন্য অতিরিক্ত প্রটোকল ও উপঢৌকনের ব্যবস্থা করতে হয়। এক্ষেত্রেও তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ভয় বা মানসিক চাপ কাজ করে।

অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবেদনশীল বিষয়ে বিচারকালে বিচারকেরা মানসিক চাপ অনুভব করেন। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীদের আদালত বর্জন ও ভাংচুর ইত্যাদি বিষয় এ ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তবে তথ্যদাতারা এও জানিয়েছেন যে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে দৃঢ়তার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

সপ্তম অধ্যায়
ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা

৭.১ ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা সম্পর্কে ধারণা

"আইনের শাসন" ধারণার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা হলো একটি সমমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে নির্দিষ্ট অধিকার প্রাপ্তিতে সমান সুযোগ লাভ করা যায়। সত্যিকার অর্থে, ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা হলো এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী তাদের অভিযোগ আইনি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান করতে পারবেন[৭৫]। ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সেবা নয়, বরং একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত[৭৬]। ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা। সকল নাগরিকের জন্য কার্যকর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা না গেলে ন্যায়বিচার ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং আইনের শাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[৭৭] বাংলাদেশ সরকার অসহায় দুস্থ বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তার মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীদের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত তথা ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিতে সচেষ্ট।

৭.২ ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ

বিচারপ্রার্থীদের অসচেতনতা: গবেষণায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা (বিশেষ করে দরিদ্র বিচারপ্রার্থীরা) তাদের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। এছাড়া আদালতগুলোতে খুব বেশি তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকায় বিচারপ্রার্থীদের এ ক্ষেত্রে মুহুরী, দালাল ও আইনজীবীদের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হয় এবং তারা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হন। একজন বিচারপ্রার্থী বলেছেন, "আমরা এই আদালত থেকে মামলার নকল তুলছি, নকল সব উকিল মুহুরী তোলে - আমরা এগুলো তেমন বুঝি না, নকল তুলতে উকিলকে ১০০০ টাকা দিয়েছি, সাক্ষীর নকল তুলতে উকিলকে ৮০০ টাকা দিয়েছি।"

বক্স-১০: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারে অভিগম্যতায় বাধা

"সাঁওতালরা ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। দেখা যায় আমাদের দেশে গ্রামের যারা দখলকারী আছে তারা বিভিন্নভাবে জমি দখল করে মূলত তারা স্বল্প শিক্ষিত হওয়ার কারণে জমিজমার দলিলপত্রের সংরক্ষণ কীভাবে করতে হয় তারা জানে না - এ সুযোগটা দখলকারী কাজে লাগায়। আবার কীভাবে সাক্ষী আনতে হবে এবং সাক্ষী ও কোর্টে আসার যে পদ্ধতিটা তা তারা জানে না। তারা সাক্ষী আনতে পারে না। এক্ষেত্রে কোর্টে ও থানায় তেমন কোনো সহযোগিতা পায় না। তখন বিচারকদের কোনো কিছুই করার থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, তারা কোর্টে আসে এবং তাদের সাথে এলাকার কিছু দালাল শ্রেণীর লোক নিয়ে আসে। একজন আইনজীবী যদি ১০ টাকা পরিচালনা করার জন্য নেয়, সাথে আসা এলাকার লোক তাদের কাছ থেকে নেয় ৩০০ টাকা। সাঁওতালরা অনেক দালালের শিকার হয়"- একজন তথ্যদাতা

মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা: বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে তৈরিকৃত ব্যবস্থা ও আইন দ্বারা পরিচালিত। এ ব্যবস্থায় মামলা দায়ের থেকে শুরু করে মামলার রায় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিচারিক ক্ষেত্র, দ্বৈত অবস্থান ও ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কর্তৃত্বের সংঘাত, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিগত জটিলতা সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভীতির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং বিভিন্নভাবে কোর্ট কর্মচারী ও আইনজীবীদের কাছে জিম্মি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

মামলার দীর্ঘসূত্রতা: বিচারক স্বল্পতা, আদালতের অবকাঠামোগত ঘাটতি, আইনজীবীদের অদক্ষতা ও ব্যবসায়িক মনোভাব এবং পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে মামলার দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। সাধারণ বিচারপ্রার্থী অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার

[৭৫] Mcfadden, Patricia, "Democracy : A Gendered Relation of Power. Problems of creating a Feminist African Culture" available at http://www.lolapress .org/artenglish/fadde6.htm (undated)

[৭৬] Khair, Sumaiya (2008) "Legal Empowerment for the Poor and the Disadvantaged: Strategies Achievements and challenges". ISBN: 9848684964, Dhaka.

[৭৭] আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, মো. জসিমউদ্দীন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

ফাঁদে পড়ার কারণে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত না করার ক্ষেত্রে মামলার এ দীর্ঘসূত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মামলা পরিচালনায় ব্যয়: মামলা পরিচালনার জন্য বিচাপ্রার্থীদের আইনজীবীদের দক্ষতার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যবসায়িক মানসিকতার কারণে মামলা পরিচালার জন্য উচ্চ মূল্যেও ফি নির্ধারণ ও মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলমান রাখার প্রবণতা কোনো কোনো আইনজীবীর মাঝে দেখা যায়। ফলে বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া মামলা পরিচালনায় পদ্ধতিগত জটিলতা ও প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও কোর্ট কর্মচারীদের দ্বারা সংগঠিত দুর্নীতির কারণে মামলা পরিচালনায় বিচারপ্রার্থীদের অনেক খরচ বহন করতে হয়। আবার, অনেকক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের দুরবর্তী অঞ্চল হতে জীবিকা নির্বাহের নিয়মিত কাজ বন্ধ করে মামলার কারণে আদালতে উপস্থিত হতে হয়। এ কারণে মামলা পরিচালনার প্রকৃত ব্যয় অত্যধিক হয়ে থাকে। দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের এ ব্যয় বহন করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাই মামলায় হেরে যাওয়ার ও ন্যায়বিচার না পাওয়ার তথা বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত না হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। একজন বিচারপ্রার্থী উল্লেখ করেছেন, "দরিদ্র বিচারপ্রার্থী হিসেবে আদালতে এসে সময় আর টাকা পয়সা নষ্ট করতেছি। সঠিকভাবে কোর্ট বসছে না। গত এক বছর হাকিম কোর্টে উঠে নাই। ১২-১৫টা তারিখ এভাবে গেছে যে হাকিম এজলাসে উঠে নাই কিন্তু উকিল, মুহুরী এবং পেশকারকে ঠিকই টাকা দেয়া লাগছে।"

হয়রানি: গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এ গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, অনেক বিচারপ্রার্থীদের মামলার শুরুতে আইনজীবী খুঁজে পেতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আইনজীবী ও তাদের মুহুরীরা অনেক সময় বিচারপ্রার্থীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এই আচরণ টাকার পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- হাজিরার সময় বেশি টাকা দিলে ভালো ব্যবহার করেন, আর নয়তো খারাপ ব্যবহার করেন। এছাড়া তথ্যদাতারা বলেছেন যে, আইনজীবীরা অনেক সময় বিচারপ্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় দেন না। এছাড়া নারী, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক বা দরিদ্ররা আদালতে এসে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তথ্যদাতারা আরো জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা আইনজীবীদের সাথে সহজে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন না বরং আগে আইনজীবীর সহকারী বা মুহুরীর সাথে যোগাযোগ করতে হয়। একজন বিচারপ্রার্থী উল্লেখ করেছেন, "মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার আইনজীবী আমাকে পূর্ণ সহায়তা করে না। আমার আইনজীবীর সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারি না। মুহুরীর সাথে কথা বলতে হয়। মামলার ঝুঁকি সর্ম্পকে সব সময় আমাকে বলে না। আইনজীবী আমার সাথে সব সময় ভালো আচরণ করে না।"

তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি: তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিচারপ্রার্থীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন না এবং নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আদালতে আসার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভয় বা শঙ্কা কাজ করে। অনেক আদালতে কক্ষ নির্দেশনা না থাকা বা পড়তে না জানার কারণে আদালতে এসে কোথায় যাবেন বা কোথায় গেলে সঠিক সেবা পাবেন তা বিচারপ্রার্থীরা বুঝতে পারেন না। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বিচারপ্রার্থীরা হয়ত আসতে একটু দেরি করলেন, তখন আইনজীবী বা মুহুরী বকাঝকা করেন। বলেন যে, মামলার সাক্ষীর হাজিরা আজ হবে না। আবার অনেক সময় হুমকি দেন এই বলে যে, "তোমার মামলার বিষয়ে তুমি ভালো বলতে পারো নি, তোমার জন্যই মামলা নষ্ট হবে, তুমিই দায়ী থাকবা।"

সহায়ক পরিবেশ: গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনো আদালতেই প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই এমনকি লিফটও অনেক আদালতে সচল নেই। তাই প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীদের চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বিচারপ্রার্থীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাভেদে বৈষম্যের শিকার হন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী বিচারপ্রার্থীদের সাথে আইনজীবী ভালো ব্যবহার করেন এবং সময় দেন এবং তুলনামূলক দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের তেমনভাবে গুরুত্ব দেন না। একজন বিচারপ্রার্থী বলেছেন, "দরিদ্র বিচারপ্রার্থী হিসেবে আদালতে এসে কোনো ধরনের সহযোগিতা পাই নাই। আমার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায় নাই, আমি গরিব বলে। আদালতের সবাই আমার থেকে অনেক টাকা নিয়েছে কিন্তু আমার কোন কাজ করে নাই।"

৭.৩ জাতীয় আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা

আইনের সমান আশ্রয়লাভ এবং আইনসঙ্গত ব্যবহারলাভ এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্রটির ১০ নং অনুচ্ছেদে[৭৮] প্রতিটি মানুষের ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বিচার

[৭৮] "Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him."; article 10, Universal Declaration of Human rights, 21 September, 1948

পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ১৯(১), ২৭, ৩১ ও ৩৫(৩) অনুযায়ী আইনের আশ্রয় লাভ ও প্রতিকার অর্জনের অধিকার রয়েছে[৭৯]। সংবিধানে উল্লিখিত এসকল স্বীকৃতি সত্ত্বেও দুর্নীতি, অনিয়ম, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অজ্ঞতা, ও সামাজিক নানা প্রতিকুলতার কারণে জনগন এ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ জনগনকে আইনের সুরক্ষা প্রাদানের উদ্দেশ্যে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০' প্রণীত হয় এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা [৮০] সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে দেশে বিচারপ্রার্থীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়[৮১] পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র সহকারি জজ/ সহকারি জজ পদমর্যাদার বিচারককে লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়েছে, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি এবং চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও গরিববান্ধব করার লক্ষ্যে সরকারি আইন সহায়তা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে সংশোধনী[৮২] আনা হয়েছে যার মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থিকে নানা ধরনের আইনি সেবা আইনগত সহায়তা সংস্থার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এগুলো হলো- আইনগত পরামর্শ প্রদান; বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ; বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ; মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ; আইনজীবীর ফি পরিশোধ; মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ; বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ; লিগ্যাল এইড প্রাপ্ত মামলায় ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যায় পরিশোধ; ফৌজদারি মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার আলোকে মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যায় পরিশোধ। আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪[৮৩] এর ২ নং ধারা অনুযায়ী কোনো অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি যার বার্ষিক গড় আয়- সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১,৫০,০০০/- টাকা এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয়; বা কর্মক্ষম নন, আংশিক কর্মক্ষম, কর্মহীন বা বার্ষিক ১,৫০,০০০/- টাকা আয় করতে অক্ষম এমন মুক্তিযোদ্ধা; বা যে কোন শ্রমিক যার বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয়; বা কোনো শিশু; বা মানব পাচারের শিকার কেনো ব্যক্তি; বা শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু; বা নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবঘুরে; বা কোনো উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের লোক আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সাধরণভাবে, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান অফিসের তালিকাভূক্ত প্যানেল আইনজীবী রয়েছে। যেসকল সহায়তা প্রার্থী মামলা পরিচালার জন্য সহায়তা চায় তাদের মামলাগুলো এই প্যানেল আইনজীবীরা পরিচালনা করে এবং এর জন্য প্যানেল আইনজীবীরা সরকার থেকে নির্ধারিত ফি পেয়ে থাকেন।

আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা এবং এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অবহিতকরণসহ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন, আইনি সেবা প্রদান আরও বিস্তৃত ও সহজ করার লক্ষ্যে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন নং ১৬৪৩০ চালু ইত্যাদি। এছাড়া মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে এ অফিসগুলোকে 'এডিআর কর্নার' বা বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির কেন্দ্রস্থল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

---

[৭৯] "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" ; অনুচ্ছেদ ১৯(২), গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী"; অনুচ্ছেদ ২৭, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

"আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যাতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"; অনুচ্ছেদ ৩১, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

"ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্যে বিচারলাভের অধিকারী হইবেন"; অনুচ্ছেদ ৩৫(২), গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

[৮০] এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠা করিবে; অনুচ্ছেদ-১, ধারা-৩, আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০।

[৮১] প্রতি জেলায় ৩ জন স্টাফ এবং ৬৪ জেলার জন্য মোট ১৯২ টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারি আইনি সেবা: উন্নয়ন ও অগ্রগতির ৭ বছর; বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা।

[৮২] আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫

[৮৩] আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) এর ধারা ৭ এর দফা (ক) এর বিধান মোতাবেক বিগত ২৪ মে, ২০০১ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস.আর. ও নং ১৩০-আইন/২০০১ মূলে জারীকৃত আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ বাতিলক্রমে ২০১৪ সালে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৯৪ আইন/ ২০১৪ মূলে আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ জারি করা হয়।

হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৩১ হাজার ৬২৬ জনকে সরকারিভাবে আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত ৬৪ হাজার ৫৪৬টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩৯ জনকে মামলায় আর্থিক সহায়তা, কারাগারে আটককৃত ৪০ হাজার ৭১৫ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।[৮৪] এ গবেষণায়ও দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলা লিগ্যাল এইড অফিস বিচারপ্রার্থীদের বেশ সফলভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। অপরদিকে আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নানা ইতিবাচক উদ্যোগ ও অনুকরণীয় ভাল দৃষ্টান্ত থাকা স্বত্ত্বেও সার্বিকভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

৭.৩ আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

জনবল ঘাটতি: একটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে একজন লিগ্যাল এইড অফিসার ও দু'জন কর্মচারী আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য কর্মরত থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আইনগত সহায়তা প্রদানে জন্য এ জনবল সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে আইনগত সহায়তা গ্রহণে আগত বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অনেক এলাকায় সহায়তা প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এ সকল বিচারপ্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করা অফিসের কর্মীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে। আবার কিছু এলাকায় দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসার অনুপস্থিত থাকলে সেবা কার্যক্রম কিছুটা কমে যায়। এক্ষেত্রে অফিস সহকারীর অর্পিত দ্বায়িত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং একজন অফিস সহকারীর পক্ষে যথাযথভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। একজন তথ্যদাতা উল্লেখ করেছেন, “আমাদের এখানে লিগ্যাল এইডের স্থায়ী অফিসার নেই। অথচ আমাদের মামলা অনেক। এখানে কখনোই পারমানেন্ট অফিসার ছিলো না। এডিআর করতে হয়। গতকালকে একজন এডিআর করতে আসছে। আমার সময় ছিলো না তাই বিকাল চারটার সময় এডিআর করার জন্যে তাদের ডাকছি, এভাবে লেট হওয়ায় তারা হতাশ হয়ে গেলো।”

বাজেট ঘাটতি: আইনগত সহায়তা সংস্থা জেলা পর্যায়ে লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করে। তথ্যদাতাদের মতে, পূর্বে নির্ধারিত বরাদ্দকৃত অর্থ অনেক জেলা হতে ফেরত গেলেও বর্তমানে বরাদ্দকৃত অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যায়। আইনগত সহায়তা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লিগ্যাল এইডের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কিছু ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, জেলা পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ থাকলেও উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ফলে আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। আবার, বাজেট ঘাটতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীদের পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ করা যায় না। তথ্যদাতাদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে মামলার বিল পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় যা মামলা পরিচালনায় আইনজীবীদের নিরুৎসাহিত করে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিক ঘাটতি: অনেক এলাকায় দেখা গেছে যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা নেই। এছাড়া সহায়তা প্রার্থীদের বসে অপেক্ষা করার স্থান পর্যাপ্ত নেই। একটি এলাকায় দেখা যায় যে যে জেলা লিগ্যাল এইডের অফিসটি ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত যা বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য সহজে পৌছানো কষ্টসাধ্য বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। এছাড়া জেলা আইনগত সহায়তা কার্যালয়ে অধস্তন আদালতের অন্যান্য শাখার মতোই লজিস্টিক ঘাটতি বিদ্যমান। লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিভিন্ন সময় লিগ্যাল এইড প্রচারনার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যেতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গাড়ির সুবিধা না পাওয়ায় এ ধরনের কার্যক্রম কিছু ক্ষেত্রে ব্যহত হয়।

প্যানেল আইনজীবীদের নিয়োগে চ্যালেঞ্জ: লিগ্যাল এইড মামলা পরিচালনায় প্যানেল আইনজীবীদের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মামলা পরিচালনার দক্ষতার উপর মামলার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, কিছু ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য তদবির বা প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তথ্যদাতাদের মতে, লিগ্যাল এইড মামলায় সম্মানি কম[৮৫] হওয়ার কারণে অভিজ্ঞ আইনজীবীরা সাধারণত লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা করতে আগ্রহী হন না বা লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনাকারী প্যানেল আইনজীবীদের মামলা পরিচালনায় অনীহা এবং মনোযোগের অভাব দেখা যায়।

---

[৮৪] http://lawyersclubbangladesh.com/bangla/2017/07/29/

[৮৫] লিগ্যাল এইড মামলায় একজন প্যানেল আইনজীবী ফৌজদারী মামলায় ৭০০ টাকা আর সিভিল মামলায় ১৮০০ টাকা পায়। মামলা দায়ের করে একটি নিস্পত্তি করলে ৫০০ টাকা, শুনানী করে গেলে ৭০০ টাকা, এবং জামিনের আবেদন ও দাখিলের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা পায়। একজন প্যানেল আইনজীবী একটি ফৌজদারি মামলায় ১২ মাসে ৮৩০০ টাকা পায়। যা অন্যান্য মামলা তুলনায় অত্যন্ত কম।

আইনগত সহায়তা প্রদানে দুর্নীতি ও সহায়তা প্রার্থীর হয়রানি: আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে বিচারপ্রার্থীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্যানেল আইনজীবীরা অনেক সময় আইনগত সহায়তা প্রার্থীদের নিকট থেকে নিয়বহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করেন। কিছু ক্ষেত্রে বিবাদী ও বাদী উভয় পক্ষের নিকট হতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। একইভাবে কোনো কোনো রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর বিরুদ্ধে লিগ্যাল এইডের দরিদ্র বিচারপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও মামলায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে টাকা ছাড়া কাজ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। বিচারপ্রার্থীরা এ সকল ক্ষেত্রে মামলা নষ্ট হওয়ার ভয়ে তাদের দাবি পূরণ করেন। আবার, অনেকক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবীরা তাদের কাছে আগত বিচারপ্রার্থীদের লিগ্যাল এইড সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রদান করে। যেমন- এখানে মামলায় টাকা পয়সা না থাকার কারণে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি।

অনেক তথ্যদাতা অভিযোগ করেন যে, আদালতে মামলা চলাকালীন অনেক সময় সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও তার মুহুরীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। আবার, কোনো ক্ষেত্রে আইনজীবীদের আপোষ এবং মামলা দ্রুত শেষ করার বিষয়ে অনাগ্রহ থাকে। এছাড়া কোনো কোনো তথ্যদাতা অভিযোগ করেন, জেলখানায় দীর্ঘদিন থাকা বিচারপ্রার্থীদের জন্য লিগ্যাল এইড এর সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু অনেকাংশ আইনজীবীদের জেলখানায় যাওয়ার অনাগ্রহের জন্য এ ধরনের সেবা কার্যক্রম ব্যহত হয়।

কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে নিজস্ব স্বচ্ছল মক্কেলের সাথে পূর্বেই চুক্তি সম্পন্ন করে লিগ্যাল এইডে মামলা পরিচালনার সুযোগ কাজে লাগানোর অভিযোগও পাওয়া যায়। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবী পেশাগত ব্যাবসায়িক মনোভাবের জন্য বিচারপ্রার্থীদের একটি মামলার সাথে বিশেষ করে যৌতুক মামলার ক্ষেত্রে একাধিক মামলা সংযুক্ত করতে উৎসাহিত করে যা মূলত বিচারপ্রার্থীর সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অপরদিকে, তথ্যদাতারা আরোও অভিযোগ করেন, অনেক ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইডের মামলা হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কোর্ট কর্মচারি নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করে। একজন তথ্যদাতা বলেছেন, "আমাদের এখানে লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবী যারা আছে তাদের মধ্যে ২-১ জন। অনেকে দেখা যায় ২-৪ দিন মামলা চালায়ে বলে এখানে কাজ হবে না। পরে অন্যভাবে মামলা চালায়। প্যানেল লইয়াররা টাকা চায়। সাধারণত জুনিয়র আইনজীবীরা আগ্রহী হয়। এগুলোতে পয়সা কম তাই যোগ্য লোক আসে কম। লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবীদের ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞরাই বেশি আসে।"

তদারকির ঘাটতি: গবেষণায় তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার কিছু ক্ষেত্রে তদারকির ঘাটতি রয়েছে। যেমন- কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবী কর্তৃক কোনো কোনো সময় বিচারপ্রার্থীরা হয়রানির শিকার হন।

আইনগত সহায়তা সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি: আইনগত সহায়তার সেবাসমূহ সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি এবং বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেনতার অভাব রয়েছে। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার বিষয়টি অনেকটা শহরকেন্দ্রিক। শহরে সভা, মিটিং, লিফলেট এবং বাৎসরিক র‍্যালির মাধ্যমে প্রচারণা করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো এলাকায় শহরের ক্যাবল টিভি বা রেডিও ও আঞ্চলিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারণা করা হয়। অপরদিকে তৃণমূল পর্যায়ে এ ধরনের প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণায় বাজেট ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্গম ভৌগলিক অবস্থানের কারণে যানবাহন খরচ বেশি হলেও বাজেট বরাদ্দ না থাকার কারণে প্রচারণা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনগণের মধ্যে আইনগত সহায়তা বিষয়ে এখনও সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি।

তৃণমূল পর্যায়ের কমিটিসমূহের কার্যকরতার ঘাটতি: জেলা লিগ্যাল এইড কার্যক্রম কার্যকর করার জন্য আইনের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিকাংশ তথ্যদাতা জেলা কমিটির নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করলেও উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির অকার্যকরতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। আইনে প্রতি দুইমাসে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠীত হওয়ার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে কোনো বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ফলে এ সকল কমিটি নিজস্ব অর্থিক খরচের মাধ্যমে কোনো সভা অনুষ্ঠানে আগ্রহী হয় না।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি: লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও লিগ্যাল এইড কর্মকর্তাদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি বিদ্যমান। তবে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, পর্যায়ক্রমে লিগ্যাল এইড কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যদিকে প্যানেল আইনজীবীদের লিগ্যাল এইড মামলা পরিচালনায় দক্ষতা তৈরিতে প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নাই।

অষ্টম অধ্যায়

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

৮.১ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ

আইনি সীমাবদ্ধতা ও দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: গবেষণায় দেখা গেছে যে, অধস্তন আদালতগুলোর তদারকির ক্ষেত্রে একটি দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিরাজ করছে যার দরুণ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা: এ গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে অধস্তন আদালতগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি অন্যতম। অধস্তন আদালতগুলোতে অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি: এ গবেষণায় আদালত থেকে তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা বা তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্যদাতারার জানিয়েছেন যে, আদালতে তথ্য পেতে সংশ্লিষ্টদের নানা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। আদালত প্রাঙ্গণে আদালতের সেবা বা মামলা সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য সম্বলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার না থাকা, কোনো তথ্য কিভাবে কোন জায়গায় পেতে হবে সে সম্পর্কেও কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকা, তথ্য কেন্দ্র না থাকা, পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, নিয়মিত অডিট বা আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের বাধ্যবধকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি: এ গবেষণায় দেখা যায় যে আদালতের বিচারিক, প্রশাসনিক ও মামলা পরিচালনার কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কার্যক্রম জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিয়মিত এবং যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে। দেখা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। যেমন- আইনজীবীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের মামলা পরিচালনার কার্যক্রমের কোনো তদারকি করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্বার্থের সংঘাতের কারণে জাবাদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকিতেও ঘাটতি বিদ্যমান এবং তাদের অনিয়ম দুর্নীতি বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এসবের ফলে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে, দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে আদালতে জবাবদিহিতা কাঠামো কার্যকর হচ্ছে না। এছাড়া দেখা যায় যে আদালতে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা না থাকায় দুর্নীতি অনিয়মের তথ্য প্রকাশিত হয় না এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

এছাড়া দুর্নীতি বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হার অনেক কম। তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন যে, অনেক ক্ষেত্রে আদালতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও আইনজীবীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন যে, সাধারণত বিচারপ্রার্থীরাও দুর্নীতি বা হয়রানির অভিযোগ জানাতে চান না। কারণ অভিযোগ করলে মামলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বার কাউন্সিলও অভিযুক্ত আইনজীবিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অধস্তন আদালতসমূহে সরকারের অন্যান্য বিভাগসমূহের মতো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনার কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা: এ গবেষণায় আরো দেখা যায় যে বাংলাদেশের মামলা ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে যার দরুণ মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৮.২ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল

মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রীম কোর্টের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়ন: দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হচ্ছে।

বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যহত: এ গবেষণায় দেখা যায় যে, অধস্তন আদালতের সুশাসনের ঘাটতি বিশেষ করে অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতির কারণে আদালতগুলোর বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যহত হচ্ছে।

মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাজট: গবেষণায় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে আদালতের সুশাসনের ঘাটতির কারণে আদালতগুলোর বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যহত হচ্ছে যার ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রতা বা মামলাজট সৃষ্টি হচ্ছে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন: আদালতের নানাবিধ সুশাসনের ঘাটতি বিশেষ করে জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ঘাটতির ফলশ্রুতিতে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে নিয়মে পরিণত হচ্ছে। বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভোগান্তি: অধস্তন আদালতে মামলা পরিচালনার কাজে এসে বিচারপ্রার্থীদের নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন মামলা চলমান থাকা, তথ্য না পাওয়া এবং দুর্নীতির শিকার হওয়া অন্যতম।

বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি: দ্বৈত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কারণে প্রকৃত অর্থে কার্যকরভাবে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সুফল ভোগ করা যাচ্ছে না। বিচারকদের নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির বিষয়গুলো আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায়[৮৬] কিছু ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের ওপর প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া বিচারকরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানা ধরণের তদবির ও চাপের সম্মুখীণ হয়ে থাকেন যা তাদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৮.৩ অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যহত: এ গবেষণায় দেখা যায় যে, অধস্তন আদালতে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যহত হচ্ছে।

বিচারপ্রার্থীদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া: দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা পরিচালনা ও নানা ধরনের দুর্নীতি অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হওয়ার ফলে বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

জনগণ বা বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে বিচার কার্যক্রমে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে ভীতি সৃষ্টি: অধস্তন আদালতে সুশাসনের ঘাটতির সামগ্রিক প্রভাব হিসেবে বিচারপ্রার্থীদের মনে আদালত সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে আদালতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয় বা টাকা ছাড়া আদালতে কোনো কাজ হয় না।

ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি: মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলা জট, বিদ্যমান নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি সৃষ্টির ফলে কিছু ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

সারণি-৮.৩.১: অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা • প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (আইনী, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি) • কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি • স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি • মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা	• মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিমকোর্টের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়ন • বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া • মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলা জট • দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন • বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভোগান্তি • বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি সৃষ্টি	• বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হওয়া • বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন • বিচারপ্রার্থীদের আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীতি সৃষ্টি • ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি

[৮৬] এখনো পৃথক হয়নি বিচার বিভাগ চলছে দ্বৈত শাসন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ২০১৬

নবম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৯.১ উপসংহার

সুশাসন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আদালতের ভূমিকা অপরিহার্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করা, আইনি বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা, বেআইনি আচরণের পরিণাম নির্ধারণ করা এবং আইনি অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে আদালত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্বিকভাবে আদালতের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়া এ গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ ও কার্যকর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব কারণে কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত এবং মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি সৃষ্টি হচ্ছে আবার দুর্নীতির কারণেও মামলার দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে।

দেশের প্রতিটি অধস্তন আদালত ব্যবস্থার পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালত অঙ্গনে প্রবেশ করার সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার বিশ্বাস এবং আস্থার মাত্রা বেড়ে যায়। একটি আদালতে বিচারপ্রার্থীসহ অন্যান্য সকলের জন্য সমান আইনের সুরক্ষা এবং সফল কার্যসম্পাদনের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

৯.২ সুপারিশ

অধস্তন আদালতের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে ন্যায়বিচার প্রদান, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে:

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে;
২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে;
৩. যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে - বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;
৪. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
৫. বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;
৬. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে;
৭. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে;
৮. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে - বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ:

৯. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে;
১০. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;

১১. নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বাৎসরিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:

১২. বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা দ্রুত গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং সকল বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে;

১৩. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে-

- প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
- বিচারক এবং আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে;

১৪. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;

১৫. প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ:

১৬. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কোনো দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭. বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

অন্যান্য:

১৮. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকার ও নাগরিক সমাজকে একসাথে কাজ করতে হবে

পরিশিষ্ট-১: দেওয়ানী মামলার কার্যপদ্ধতি

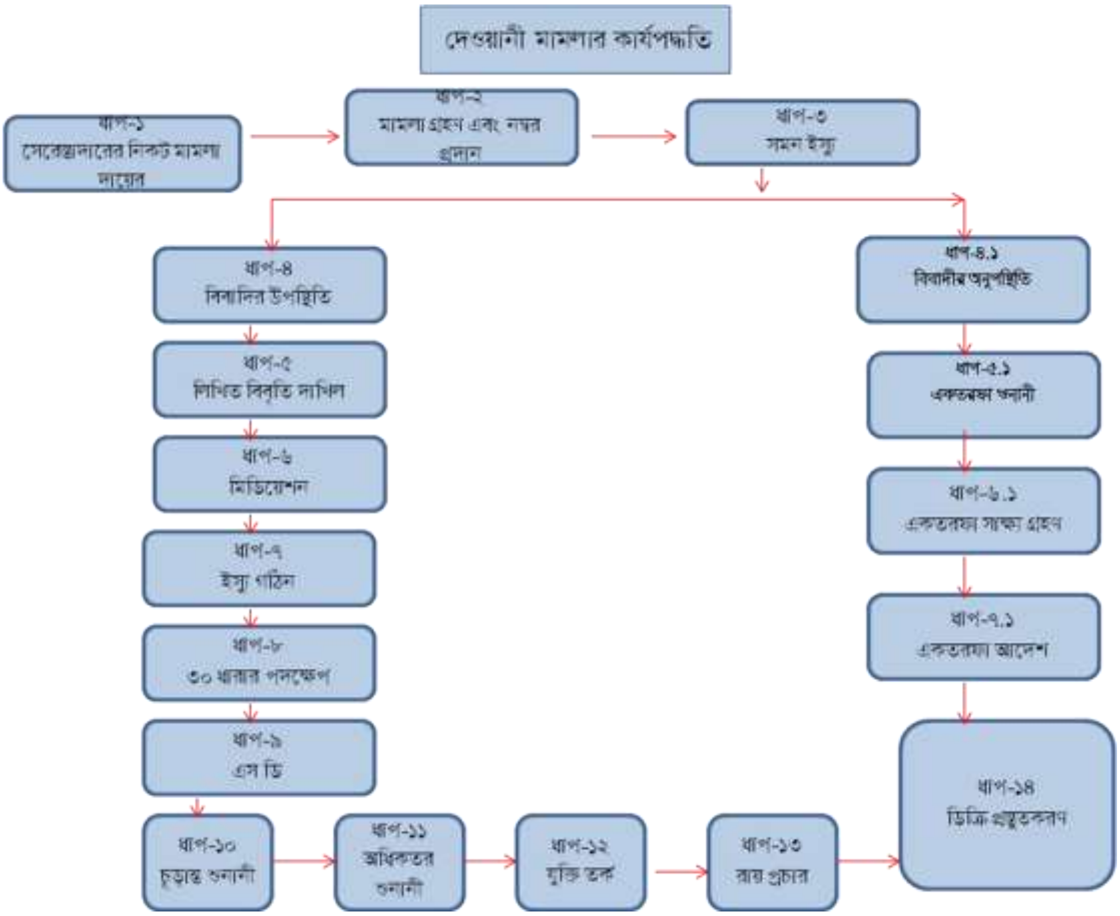

পরিশিষ্ট-২: ফৌজদারী মামলার কার্যপদ্ধতি

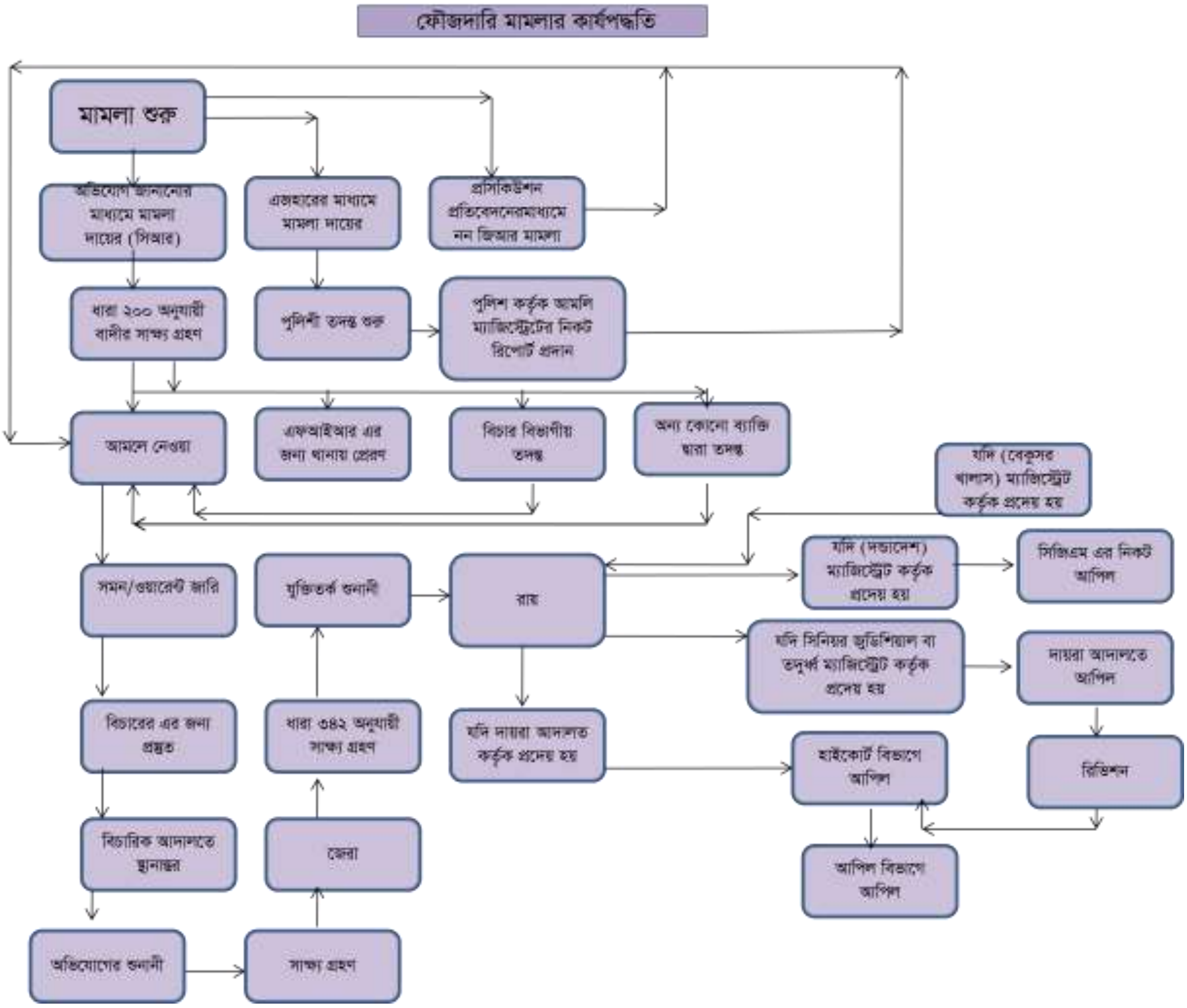

তথ্যসূত্রঃ

Cambridge University Press (2007) ***"Global Corruption Report 2007"***, New York. ISBN 978-0-521-70070-2

Transparency International Romania (2015) ***"ENHANCING JUDICIARY'S ABILITY TO CURB CORRUPTION "*** a practical guide;

UNDP, UK aid (May 2015) ***"Access to Justice in Bangladesh Situation Analysis: Summary Report; conducted by Data Management Aid "***; Justice Sector Facility Project, Law and Justice Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh,.

UNDP (2013) ***"Annual Report 2013 "***; Judicial Strengthening Project, Supreme Court of Bangladesh;.

"The World Justice Project Rule of Law Index 2016 ", ISBN (online version): 978-0-9882846-1-6.

Goran Hyden and Ken Mease (May 2003) ***"The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries; Julius Court "***; World Governance Survey Discussion Paper, pg9.

হক. হামিদুল (২০১৭) ***"বিচার প্রক্রিয়াঃ দেওয়ানী ও ফৌজদারী " ,*** ঢাকা; ISBN: 9789849156390

খান. মোহাম্মদ, মিয়া.মোহাম্মদ (মে, ১৯৯৩) ***" ফৌজদারি বিচার কার্য্রক্রম" ,*** ঢাকা

"প্রতিবেদনঃ জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৬ " , বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

Akkas, Sarkar Ali (2004) "***Appointment of Judges: A Key Issue of Judicial Independence,"*** Bond Law Review: Vol. 16: Iss. 2, Article 8. P 201; Available at: http://epublications.bond.edu.au/blr/vol16/iss2/8

H. Alvaro and L.Gaspar(2010) ***"Access to Information and Transparency in The Judiciary, a Guide to good practices from Latin America"*** Asociación por los Derechos Civiles (ADC),p9

Mcfadden, Patricia (1997) ***"Democracy : A Gendered Relation of Power. Problems of creating a Feminist African Culture"*** available at http://www.lolapress .org/artenglish/fadde6.htm (undated)

Khair, Sumaiya (2008) ***"Legal Empowerment for the Poor and the Disadvantaged: Strategies Achievements and challenges".*** ISBN: 9848684964, Dhaka.

"Banglore Principles 2002"; https://www.unodc.org/pdf/ Bangalore_principles.pdf- Access on 20th September, 2017

Rahman, Wali-ur (June, 2005) ;***"Judicial Training in the New Millennium",*** Bangladesh Institute of Law and International Affairs (BILIA) ISBN: 9843224493, Dhaka

Halim.Abdul (February 2004); ***" The Legal System of Bangladesh",***Dhaka